কাঠপেন্সিল

হুমায়ূন আহমেদ

কাঠপেন্সিল | হুমায়ূন আহমেদ

Kathpencil

by Humayun Ahmed
price Tk. 150.00

cover design : Masum Rahman
anyaprokash dhaka bangladesh
www.anyaprokash.net

ANYAPROKASH publication
ISBN 984 868 552 8

নিষাদনামা

বলপয়েন্ট নামে আমি ব্যক্তিগত কিছু লেখা লিখেছি। বই আকারে বেরও হয়েছে। আনন্দ, দুঃখ এবং বঞ্চনার আরো কিছু গল্প আমার ঝুলিতে আছে। মাঝে মধ্যে লিখতে ইচ্ছা করে। 'কাঠপেন্সিল' নাম দিলাম, কারণ এই লেখাগুলি ইরেজার দিয়ে মুছে ফেললে সাহিত্যের কোনো ক্ষতি হবে না, বরং লাভ হবার সম্ভাবনা আছে।

পুত্র নিষাদকে দিয়ে শুরু করি।

বইমেলা (২০০৯) শেষ হয়েছে। প্রকাশকরা লেখকদের প্রাপ্য কপি দিয়ে গেছেন। বন্ধুবান্ধবদের বিলিয়েও ঘরভর্তি বই।

পুত্র নিষাদ প্রতিটি বইয়ের ফ্ল্যাপ খোলে। তার বাবার ছবি বের করে এবং 'এইটা আমার বাবা' বলে বিকট চিৎকার দেয়। তার এই চিৎকার আমার কানে মধু বর্ষণ করে।

দুই বছর বয়সে হঠাৎ এক দুপুরে সে সমালোচকের কঠিন ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। আমাকে এসে বলল, বাবা, বই ছিঁড়ব। আমাকে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি কখনো না বলব না। তার অনেক কর্মকাণ্ডে তার মা নিষেধাজ্ঞা জারি করে। আমি করি না। করুক না যা ইচ্ছা।

আমি বললাম, ঠিক আছে বাবা বই ছেঁড়ো। সে কয়েকটা বই ছিঁড়ল এবং বুঝতে পারল, বই ছেঁড়া খবরের কাগজ ছেঁড়ার মতো এত সহজ না। তখন সে বলল, বাবা, তোমার বইয়ের উপর আমি পিসু করব।

আমার কঠিন সমালোচকদের মুখে এবার নিশ্চয়ই হাসি ফুটেছে। তাঁরা আত্মতৃপ্তি নিয়ে বলছেন, পিসাব করার মতোই জিনিস। আরো আগেই পিসাব করা উচিত ছিল। দেরি হয়ে গেছে।

যাই হোক, আমি আমার বইয়ের স্তূপের ওপর পুত্রকে দাঁড় করিয়ে দিলাম। সে হাসিমুখে পিসাব করল।

এখন আমার বন্ধুবান্ধবরা বই নিতে এলে প্রথমেই বলেন, পিসাব ছাড়া কোনো বই আছে? থাকলে দিন।

দশ বছর বয়সের নিচের শিশুদের প্রতি আমার অন্য একধরনের মমতা আছে। তারা তাদের ভুবনে আনন্দ নিয়ে বাস করে। তাদের সঙ্গে গল্প করলে তাদের অদ্ভুত ভুবনের কিছুটা আঁচ পাই। তারা বিচিত্র ধরনের খেলা খেলে। সেই খেলায় অংশ নেয়াও আনন্দের ব্যাপার।

পুত্র নিষাদের বর্তমান খেলা হলো, সে তার নিজের ছোট্ট একটা প্লাস্টিকের মগ নিয়ে এসে বলবে, বাবা, এটা গরম চা। খুব গরম। খাও।

আমি খুব গরম চা খাওয়ার অভিনয় করলাম। তারপর সে নিয়ে এল ঠান্ডা চা। আমি ঠান্ডা চা খাওয়ার অভিনয় করলাম।

তারপর চলে এল ঝাল চা। আমাকে ঝাল চা খেয়ে কিছুক্ষণ 'উঁহ আহ' করতে হলো। তখন হঠাৎ খেয়াল হলো, বারবার যে সে মগে করে পানি আনছে, কোথেকে আনছে? বোতল থেকে সে তো পানি ঢালতে পারে না। আমি বললাম, বাবা, পানি কোথেকে আনছ?

সে বলল, বাথরুম থেকে।

আমি বললাম, কী সর্বনাশ! বাবা, তুমি কি কমোড থেকে পানি আনছ? যেখানে তুমি হাগু কর সেখান থেকে?

সে বলল, হ্যাঁ।

আমি কমোডের তিন মগ পানি খেয়েছি। আমার একটাই সান্ত্বনা, আমার কিছু বন্ধুবান্ধবও নিষাদের সঙ্গে চা খাওয়ার খেলা খেলেছে। তারা চায়ের উৎস জানে না। এইজন্যেই কবি বলেছেন, Ignorence is bliss.

আমি আগেই বলেছি, দশ বছর নিচের বয়েসী শিশুদের আমি অত্যন্ত পছন্দ করি। দশ পার হলেই off limit. যাদের বয়স দশের চেয়ে বেশি তাদের ঠিক চিনতে পারি না। নিষাদের দশ হতে এখনো আট বৎসর বাকি।

আমি ঠিক করেছি আমার অন্য বাচ্চাদের আমি যেভাবে আনন্দ দিয়েছি তাকেও সেভাবে দেব। আমার অন্য বাচ্চারা ভাইবোনদের মধ্যে বড় হয়েছে। সে বড় হচ্ছে একা।

কাজেই আমি একদিন ঘোড়া সেজে বললাম, বাবা, পিঠে উঠ। আমি তোমাকে নিয়ে ঘুরব।

নিষাদ বলল, ঘোড়ায় উঠব না, তুমি ফেলে দিবে।

আমি ফেলব না। আমি অত্যন্ত শান্ত ঘোড়া। প্রায় গাধাটাইপ।

পুত্র ঘোড়ায় চড়ল। তাকে নিয়ে হামা দিয়ে এগুচ্ছি। পুত্রের মাতা বলল, কী হচ্ছে?

আমি বললাম, ঘোড়া হয়েছি। পৃথিবীতে বৃদ্ধ ঘোড়াও কিন্তু আছে।

সে বলল, তুমি একজন লেখক মানুষ। তুমি ঘোড়া হয়ে ঘুরছ, দেখতে কেমন জানি লাগছে!

আমি বললাম, আমাদের নবিজী (দ) ঘোড়া সেজে তার নাতি হাসান-হোসেনকে পিঠে নিয়ে ঘুরতেন। আমি কোন ছাড়া লেখকদের গ্র্যান্ডমাস্টার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নাতনিদের পিঠে চড়িয়ে ঘুরতেন। ঘোড়ার প্রতি তাঁর বিশেষ দুর্বলতাও ছিল। ঘোড়াকে নিয়ে তাঁর বিখ্যাত সব কবিতা আছে।

ঘোড়া নিয়ে তিনি কখন কবিতা লিখলেন?

আমি কবিতা আবৃত্তি করলাম—

তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে
টগবগিয়ে তোমার পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে॥

অশ্বারোহীর মা ক্যামেরা নিয়ে এল। তার একটা ডিজিটাল ক্যামেরা আছে। এই ক্যামেরায় এক লক্ষ ছবি তোলা হয়েছে, যার সবই পুত্র নিষাদের। বললাম, একটা ছবি *মানবজমিন* কাগজে পাঠিয়ে দাও। ওরা অনেক দিন আমাকে নিয়ে কিছু লিখতে পারছে না। লেখার সুযোগ করে দাও। ক্যাপশন হবে— 'হুমায়ূন আহমেদ এখন ঘোড়া।'

মাটি কাটা ছাড়া এই জগতে দ্বিতীয় কঠিন কাজ হচ্ছে শিশুদের ঘুম পাড়ানো। ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে যিনি শিশুদের ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করেন প্রায়ই দেখা যায় গানের সুরে তিনিই ঘুমিয়ে পড়েন, শিশু জেগে থাকে।

নিষাদকে ঘুম পাড়ানোর কঠিন কাজটি আমাকে প্রায়ই পালন করতে হয়। আমি গল্প বলে এই চেষ্টাটা করি।

গল্প শুনবে বাবা?

শুনব।

রাজার গল্প?

না।

রানিদের গল্প? শেখ হাসিনা, খালেদা?

না।

ভূত-প্রেত রাক্ষস-খোক্কস ?

না।

তাহলে কিসের গল্প শুনবে ?

এসির গল্প।

এসি নামক যন্ত্রটি তার মাথায় কীভাবে ঢুকে গেছে আমি জানি না। একটা কারণ হতে পারে—গরমে যখন কষ্ট পায় তখন এসির ঠান্ডা বাতাসে আরাম পায়। দ্বিতীয় কারণ, চারকোনা একটা বড় বোতাম টিপলেই হিম হাওয়া দেয় এই রহস্য।

যাই হোক, আমি এসির গল্প বলার প্রস্তুতি নিলাম। গল্প বানানো তো আমার জন্যে তেমন কঠিন না (চল্লিশ বছরের অভ্যাস)। কিন্তু পড়লাম মহাবিপদে। এসি নিয়ে কী গল্প ফাঁদব! বাবা এসি, মা এসি এবং তাদের শিশুসন্তান এসির মানবিক গল্প ? সেটা তো বিশ্বাসযোগ্য হবে না। যে-কোনো গল্পকেই বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। আমি শুরু করলাম, একদেশে ছিল একটা এসি।

নিষাদ বলল, আর ছিল একটা এসি রিমোট।

আমি বললাম, গল্পের মাঝখানে কথা বলবে না বাবা। গল্পের মাঝখানে কথা বললে গল্প বন্ধ হয়ে যায়।... একদিন কী হলো শোনো। এসিটা বলল, মানুষকে ঠান্ডা বাতাস দিতে আমার খুব কষ্ট হয়। আমার শরীর গরম হয়ে যায়। তখন জ্বর আসে। আমি সারারাত মানুষকে ঠান্ডা বাতাস দেই। আর সারারাত আমার গা এত গরম হয়ে থাকে। এত জ্বর আসে।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি এসির প্রতি মমতায় আমার পুত্রের ঠোঁট ভারী হয়ে এসেছে। সে বলল, বাবা, এসি বন্ধ করে দাও, আমার ঠান্ডা লাগবে না।

এই ঘটনা আমি কীভাবে দেখব ? গল্প সৃষ্টির ক্ষমতা হিসেবে, না-কি দু বছর বয়সী শিশুর বিশুদ্ধ আবেগ হিসেবে ? লেখক হিসেবে আত্মশ্লাঘা অনুভব করার জন্যে আমি প্রথমটা নিলাম।

আমার বড় পুত্র নুহাশের কাছ থেকেও আমি আত্মশ্লাঘা অনুভব করার মতো উপকরণ একবার পেয়েছিলাম। তার বয়স তখন বারো। সে আমাকে বলল, বাবা, আমি তোমার কোনো বই যখন পড়ি তখন বাথরুমে বসে পড়ি।

আমি বললাম, বাথরুমে বসে পড়তে হবে কেন বাবা ?

তোমার বই পড়তে গেলে কিছুক্ষণ পর পর চোখে পানি আসে। সবার সামনে কাঁদতে ভালো লাগে না। এইজন্যে বাথরুমে দরজা বন্ধ করে পড়ি।

পুত্র নিষাদের কাছে ফিরে যাই। তার গল্প দিয়ে 'নিষাদনামা'র ইতি টানি।

নিষাদ খুব গানভক্ত। তার অতিরিক্ত সঙ্গীতপ্রীতি আমার মধ্যে সামান্য হলেও টেনশন তৈরি করে। কারণ গানের প্রতি অস্বাভাবিক দুর্বলতা অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে দেখা যায়।

নিষাদের গানপাগল হবার অনেকগুলি কারণ অবশ্যি আছে। তার মা শাওন গায়িকা। তার নানি তহুরা আলিও বেতার এবং টিভির তালিকাভুক্ত একজন সঙ্গীত শিল্পী। তার বড় মা (শাওনের নানিজান) একজন গায়িকা।

নিষাদের বাবা গায়ক না, গলায় কোনো সুর নেই, কিন্তু গানপাগল। তার দাদার গলাতেও সুর ছিল না, তিনিও ছিলেন গানের মহাপাগল। তার বড়দাদা (আমার দাদা) মাওলানা মানুষ ছিলেন। বাড়িতে গানবাজনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। তিনি একদিন আমার ছোটবোন শেফুর গাওয়া 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে' গান শুনে মুগ্ধ হয়ে ঘোষণা করলেন—বাড়িতে ইসলামি গান চলতে পারে। শেফুকে পর পর তিনবার একবৈঠকে গান শোনাতে হলো এবং দাদাজান কয়েকবার 'আহা আহা' করলেন।

নিষাদ যেহেতু এই ঘরানার, গানের প্রতি তার মমতা হওয়াটাই স্বাভাবিক। মায়ের সব গান এবং 'মনপুরা' ছবির সব গান তার মুখস্থ।

এক দুপুরের কথা। লেখার টেবিলে বসেছি। 'মাতাল হাওয়া' উপন্যাস লিখছি। জটিল অংশে আছি। এই অবস্থায় হাতি দিয়ে টেনেও টেবিল থেকে আমাকে নড়ানো সম্ভব না। পুত্র নিষাদ এসে তার কোমল হাতে আমাকে ধরে বলল, বাবা আসো।

আমি বললাম, কোথায় যাব ?

নিষাদ বলল, ছাদে। ঝড় হবে। তুমি ঝড় দেখবে।

আমি ঝড় দেখতে গেলাম। বৈশাখ মাসের দুপুর হঠাৎ করেই মেঘেমেঘে অন্ধকার। আকাশে এমন ঘন কালো মেঘ দেখেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রথম ভাব সমাধি হয়েছিল। আমি মুগ্ধ হয়ে আকাশের ঘন কালো মেঘ দেখছি। হঠাৎ বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়তে শুরু করল। আর তখন আমাকে ভয়ঙ্করভাবে চমকে দিয়ে পুত্র নিষাদ গাইল—

'আজি ঝর ঝর মুখর বাদল দিনে।'

এই গানটি তার মা গেয়েছে। 'নয় নম্বর বিপদ সংকেত' ছবিতেও ব্যবহার করেছি। ছবিতে তানিয়া প্রচণ্ড ঝড় বাদলায় নাচতে নাচতে গানটি করছিল। এই

গান পুত্র নিষাদ মুখস্থ করে রাখবে, এটাই স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক ব্যাপার হলো, গানটা ঝড় বাদলায় গীত হতে হবে এই বোধ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবর্ষ পরে তাঁর রচনা পঠিত হবে কি না তা নিয়ে সংশয়ে ছিলেন। শত বছরেরও পরে দু'বছরের একটি শিশু তাঁর গান করবে, এটি কি কখনো ভেবেছিলেন? আমার হঠাৎ মনে হলো, রবীন্দ্রনাথ এই দৃশ্যটি দেখছেন। এবং নিজের কবিতা থেকেই বলছেন, 'আমারে তুমি অশেষ করেছ একি এ লীলা তব!'

রান্নাবান্না

রান্নার সঙ্গে সবসময় বান্না যুক্ত হয় কেন?

খেলাধুলার তাও অর্থ করা যায়। খেলার সময় ধুলা উড়ে বলেই খেলাধুলা। খাবারের সঙ্গে যুক্ত হয় দাবার। খাবারদাবার। দাবার আবার কী? দাবারের একটি অর্থ আমি করেছি। তেমন সুবিধার খাবার যেটা না সেটাই দাবার। কোথাও দাওয়াতে গেলে (সচরাচর যাওয়া হয় না, তারপরও হঠাৎ...) টেবিলে প্রচুর খাবার দেওয়া হয়। আমি সেখান থেকে খাবারগুলি আলাদা করি, দাবারের কাছে যাই না। সাত পদ রান্না হলে পাঁচ পদই যে দাবার হবে, এটা কিন্তু নিপাতনে সিদ্ধ।

যাই হোক, রান্নাবান্নায় ফিরে যাই। চৈত্র মাসের এক দুপুরে খেতে বসেছি। টেবিলে খাবার সাজানো। ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললাম। প্রতিটি আইটেম দেখাচ্ছে রোগীর পথ্যের মতো। পানি পানি ঝোলে ধবধবে সাদা শিং মাছের টুকরা। সঙ্গের সবজি হলো কাঁচকলা। যে মেয়েটি রান্না করে তাকে ডেকে শাওন বলল, তোমাদের স্যার তরকারিতে লাল রঙ পছন্দ করেন। তেল-মসলা ছাড়া খান না।

শাওনের বক্তৃতার ফল রাতে ফলল। খেতে বসে দেখি রক্তের হোলি উৎসব। করলা ভাজির রঙও টকটকে লাল। দুপুরে ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম, রাতে বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, আমি রান্নার একটা বই লিখব।

অন্যপ্রকাশের মাজহার এই কথা শুনে আহ্লাদিত হলো। এবং সিরিয়াস মুখ করে বলল, বইয়ের নামটা বলুন, আমি ধ্রুবকে কভার করতে বলে দেই। কাজ এগিয়ে রাখি।

আজকাল টিভি খুললেই রান্না এবং টকশো'র অনুষ্ঠান। দুটো অনুষ্ঠানের মধ্যে মিলও আছে। রান্নার অনুষ্ঠান থেকে কেউ রান্না শিখতে পারছে না, টকশো'র অনুষ্ঠান থেকেও কেউ কিছু শিখছে না।

সেলিব্রেটি রান্না নামের আরেক বস্তু বের হয়েছে। গায়ক-গায়িকা, চিত্রশিল্পী, গায়ক-নায়িকারা অনুষ্ঠানে নতুন নতুন রান্না শেখাচ্ছেন। (অনুষ্ঠানের উপস্থাপিকাই পথ তৈরি করে রাখছেন। সেলিব্রেটিরা হাসিমুখে চামচ নাড়ছেন।) শাওন গায়িকা

এবং অভিনেত্রী হিসেবে এক রান্নার অনুষ্ঠানে গেল। কড়াইয়ে খুন্তি নাড়তে নাড়তে তাকে চার লাইন গানও করতে হলো।

> 'আমার ভাঙা ঘরের ভাঙা চালা ভাঙা বেড়ার ফাঁকে
> অবাক জোছনা ঢুইকা পড়ে...'

খুন্তি কড়াই এবং রঙধনু কোপ্তার (শাওনের রান্না করা খাদ্যদ্রব্যটির এটাই নাম) সঙ্গে অবাক জোছনার সম্পর্ক ঠিক বুঝলাম না।

অনেকক্ষণ হালকা কথা বললাম, এখন মাঝারি টাইপ ভারী কথা বলি। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ঔপন্যাসিক পার্ল এস বাকের (গুড আর্থ) সীমাহীন আগ্রহ ছিল রান্নাবান্নায়। তিনি রান্নার একটি বইও লিখেছেন। এই বইটির কপি আমার কাছে আছে।

কবি সৈয়দ আলী আহসান সাহেবও রান্নার বই লিখেছেন। তাঁর বইয়ের রেসিপি ব্যবহার করে শুধু রসুন দিয়ে আমার বাসায় মুরগি রান্না হয়েছিল। খেতে অসাধারণ হয়েছিল। যদিও বই দেখে রান্না কখনো ভালো হয় না, এই তথ্য নিউটনের সূত্রের মতো সত্য।

বর্তমানের এলজিআরডি মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফ সাহেব যখন মন্ত্রী ছিলেন না, তখন একরাতে আমার বাসায় আড্ডা দিতে এসেছিলেন। আড্ডায় রান্নার প্রসঙ্গ উঠতেই তিনি মোটামুটি অভিভূত গলায় বললেন, হুমায়ূন ভাই, শেখ হাসিনা যে কত ভালো রাঁধতে পারেন তা কি আপনি জানেন ?

আমি বললাম, জানি না। জানার কোনো সুযোগ নেই।

সৈয়দ আশরাফ বললেন, তাঁর রান্না শুধু যে অসাধারণ তা-না, অসাধারণের অসাধারণ।

বঙ্গবন্ধু কন্যার এই গুণটির কথা কেউই মনে হয় জানেন না। সুযোগ পেয়ে জানিয়ে দিলাম।

প্রধানমন্ত্রীর কেবিনেটে কিছু নারীমুখ দেখছি। টিভি পর্দায় তাদের যখন দেখি তখন প্রথমেই মনে হয়, আচ্ছা এই অতি ব্যস্ত মহিলা কি এখন রাঁধেন ? বা রান্নাবান্না নামক ব্যাপারটা জানেন ? তাঁদের প্রিয়জনরা কি তাঁদের হাতের রান্না খেয়ে কখনো বলেছেন, বাহ্ অসাধারণ!

আমার নিজের ধারণা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন রান্না জানেন না। রাঁধার মতো সুযোগই পান নি। রাজনীতি করে এবং বক্তৃতা দিতে দিতেই তাঁর জীবন কেটে গেছে। টিভিতে তাঁকে মাঝে মধ্যে দেখি। যাই বলেন বিকট চিৎকার দিয়ে বলেন।

মনে হয় পল্টন ময়দানে ভাষণ দিচ্ছেন, মাইক কাজ করছে না বলে চেঁচিয়ে বলতে হচ্ছে।

উনি চিৎকার করতে থাকুন, আমি রান্নাবান্নায় ফিরে আসি। প্রথমেই কুইজ— স্বাদ কত রকমের ?

তিক্ত
লবণ
মিষ্টি
ঝাল
টক

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মতো পঞ্চ স্বাদ। সবাই কুইজে ফেল করেছেন। স্বাদ ছয় রকমের। ষষ্ঠ স্বাদের নাম Umami. সব খাবারেই কিছু Umami স্বাদ থাকে। মাংসে আছে, টমেটোতে আছে। সয়াসসে আছে প্রচুর পরিমাণে। Umami স্বাদটা আসে একধরনের লবণ থেকে। লবণের নাম Monosodium glutamate.

প্রকৃতি মানুষের মুখে পাঁচ রকমের স্বাদ কেন দিয়েছেন ? দিয়েছেন আমাদের সতর্ক করার জন্যে। পৃথিবীর যাবতীয় বিষাক্ত জিনিসের স্বাদ তিতা। আমরা যেন তিতা না খাই। নষ্ট হয়ে যাওয়া খাবারের স্বাদ হবে টক। আমাদের নষ্ট খাবার বিষয়ে সতর্ক করার জন্যেই টক স্বাদ বুঝার টেস্ট বাড জিভে দেয়া আছে।

এখন আমরা বুঝে শুনে খেতে শিখেছি। আদি মানুষের সেই বোধ ছিল না। তাদেরকে নির্ভর করতে হতো জিভের ওপর।

পশ্চিমে রান্নাবান্নার পুরোটাই পুরুষদের দখলে। বাংলাদেশে ঘটনা সেরকম না। তার প্রধান কারণ আমাদের কালচারে পুরুষদের রান্নাঘরে ঢোকাকে মেয়েলি স্বভাব বলে মনে করা হয়। স্বামীদের রান্নাঘরে ঢুকতে দেখলে বিরক্ত হন না এমন স্ত্রী পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। বাংলাদেশে বাবুর্চি শব্দটাও বুদ্ধিজীবীর মতো তুচ্ছার্থে ব্যবহার করা হয়। বিখ্যাত শেফ টমি মিয়াকে বাবুর্চি টমি মিয়া বললে তিনি নিশ্চয়ই রাগ করবেন।

আমার ধারণা সব পুরুষের মধ্যেই সুপ্ত অবস্থায় রান্নার শখ আছে। আমার নিজের তো আছেই। শখ মেটাই রান্নার বই পড়ে। আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরির একটা বড় অংশে আছে রান্নার বই। আমার গল্প-উপন্যাসের চরিত্ররাও ভালো খাবার পছন্দ করে। হিমু তো করেই। সে মাজেদা খালার বাড়িতে যায় ভালো ভালো খাবারের লোভে।

মিসির আলির মতো নিরাসক্ত লোকও খাবার খেয়ে তৃপ্তির বিরাট বর্ণনা দেন।

আমার বইয়ে অনেক রেসিপিও দেয়া থাকে। অনেকে আবার সেই রেসিপি দেখে রাঁধতে গিয়ে ধরা খান। যাই হোক, একটি অতি সহজ রেসিপি দিচ্ছি। আমি এর নাম দিলাম 'ডিজিটাল জাউভাত'।

আতপ চাল লাগবে। পাটপাতা লাগবে। পেঁয়াজ-লবণ নিশ্চয়ই ঘরে আছে।

পরিমাণ ?

মেপে পরিমাণ দিতে পারছি না।

হাঁড়িতে আতপ চাল সেদ্ধ করুন। সঙ্গে সামান্য পেঁয়াজ এবং লবণ। চাল সেদ্ধ হয়ে জাউ জাউ হয়ে যাবার পর কিছু পাটপাতা (তেতোটা) দিয়ে দিন ঘোঁটা। তৈরি হয়ে গেল ডিজিটাল জাউ।

গরম গরম পরিবেশন করুন।

চেহারা দেখে কেউ খেতে চাইবে না। তবে রাঁধুনীর প্রতি মমতাবশত কিংবা ভদ্রতাবশত কেউ যদি এক চামচ মুখে দেয়, সে দ্বিতীয়বারও নেবে।

এই রেসিপি আমি পেয়েছি নিউইয়র্ক প্রবাসী এক মহিলা কবির কাছ থেকে। তাঁর নাম নার্গিস আলমগীর।

অতি সাদামাটা রেসিপি দেখে যারা নাসিকা কুঞ্চন করছেন তাদের জন্যে মিশরের ফারাওদের খাবারের একটি রেসিপি। সম্রাটদের খানা বলে কথা।

চাল, ঘি, ভেড়ার মাংস হাঁড়িতে নিন। হাঁড়ির ঢাকনা আটা দিয়ে আটকে দিন। অল্প আঁচে সাত আট ঘণ্টা রাখুন। রেসিপিতে মসলাপাতির উল্লেখ নেই বলে দিতে পারছি না। মসলা এবং লবণ দিতে ভুলবেন না।

(সূত্র : *বিরিয়ানির নেপথ্য কাহিনী*, শাহরিয়ার ইকবাল।)

রান্নার ওপর কোনো বই না লিখলেও একটা রান্নার বইয়ের ভূমিকা আমার লেখা। বইটি হলো অবসর প্রকাশনীর *ইলিশ রান্না*।

পাঠকদের জন্যে *ইলিশ রান্না* বইটির ভূমিকাটা দিয়ে দিলাম।

ভূমিকা

তখন আমেরিকার ফার্গো শহরে থাকি। জানুয়ারি মাস, হাড়কাঁপানো শীত। থার্মোমিটারে পারদ নেমে গেছে শূন্যেরও

কুড়ি ডিগ্রি নিচে। সকাল থেকেই তুষারপাত হচ্ছে। দৃশ্য খুবই সুন্দর, তবে বাইরে বের হয়ে দেখার দৃশ্য না। ঘরে বসে জানালা দিয়ে দেখার দৃশ্য।

এমন দুর্যোগের দিনেও বিকেল থেকেই আমার বাসায় অতিথিরা আসতে শুরু করল। নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি এবং মুরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশী ছাত্র। কারণ আজ আমার বাসায় ইলিশ মাছ রান্না হচ্ছে। ইলিশ মাছ এসেছে বাংলাদেশ থেকে। সিল করা টিনে ইলিশ। যতদূর মনে পড়ে সায়েন্স ল্যাবরেটরির পাইলট প্রকল্পের জিনিস। যে প্রকল্পটি শেষ পর্যন্ত কাজ করে নি।

কৌটা খুলে দেখা গেল হলুদ রঙের আলুভর্তা জাতীয় পদার্থ। সেই জিনিস তেলে ভাজা হলো। সবাই চায়ের চামচের ছ'চামচ করে পেল। সবার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। যেন অমৃত চাখা হচ্ছে।

খাওয়াদাওয়ার পর রাতভর শুধুই ইলিশের গল্প। পদ্মার ইলিশের স্বাদ বেশি, না যমুনার ইলিশের ? সুরমা নদীতে যে ইলিশ ধরা পড়ে তার স্বাদ গভীর সমুদ্রের ইলিশের মতো। তার কী কারণ ? এই নিয়ে গবেষণামূলক আলোচনা। একজন আবার শুনালেন হার্ডিঞ্জ ব্রিজের স্প্যানে ধাক্কা খাওয়া ইলিশের গল্প। স্প্যানে ধাক্কা খেয়ে ইলিশ মাছের নাক থেঁতো হয়ে যায়। সেইসব নাকভাঙা ইলিশই আসল পদ্মার ইলিশ।

এরপর শুরু হলো ইলিশ রান্নার গল্প। দেখা গেল সবাই ইলিশ রান্নার কোনো না কোনো পদ্ধতি জানে। ভাপে ইলিশ, চটকানো ইলিশ, শুধু লবণ আর কাঁচামরিচ দিয়ে সেদ্ধ ইলিশ। গভীর রাত পর্যন্ত গল্প চলতেই লাগল।

পঁচিশ বছর আগের আমেরিকার এক দুর্যোগের রাতের সঙ্গে এখনকার অবস্থা মিলানো যাবে না। এখন আমি ঢাকা শহরে বাস করি। ইলিশ মাছ কোনো ব্যাপার না। প্রায় রোজই রান্না হয়। নতুন নতুন পদও হয়। এই তো সেদিন ইংল্যান্ডের বিখ্যাত শেফ টমি মিয়া নিজে রান্না করে ইলিশ মাছের একটা পদ খাওয়ালেন—স্মোকবিহীন 'স্মোক্ড্ হিলসা'। সাহেবদের পছন্দের খাবার।

স্মোকড্ হিলসা খেতে খেতেই শুনলাম অবসর প্রকাশনা সংস্থার আলমগীর রহমান শতাধিক পদের ইলিশ রান্নার একটি বই কম্পোজ করে রেখেছেন। কাউকে দিয়ে ভূমিকা লেখানো যাচ্ছে না বলে বইটি প্রকাশ করা যাচ্ছে না। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'ভূমিকা আমি লিখে দেব।'

সাধারণত দেখা যায় লেখকদের লেখার ক্ষমতা পুরোপুরি শেষ হবার পর তারা ভূমিকা এবং সমালোচনা জাতীয় রচনা লেখা শুরু করেন। যে আগ্রহে ভূমিকা লিখতে রাজি হয়েছি তাতে মনে হয় আমার ঘণ্টা বেজে গেছে। আচ্ছা বাজুক ঘণ্টা, আমি ভূমিকাতেই থাকি।

গুরুগম্ভীর ভূমিকা লেখার বিশেষ কায়দা আছে। প্রথমেই নামের উৎপত্তিতে যেতে হয়। ইলিশ নামটা কীভাবে এল, কেন এল। এই প্রজাতির মাছ পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে পাওয়া যায়। যেসব মাছ সমুদ্রে থাকে এবং ডিম পাড়ার জন্যে মিঠা পানিতে আসে তাদের শ্রেণীবিন্যাস। সেই বিন্যাসে ইলিশের স্থান কোথায় সে বিষয়ে আলোচনা। এরপর আসবে ইলিশের ইতিহাস। বাংলা আদি সাহিত্যে (চর্যাপদে) ইলিশ মাছের উল্লেখ কেন নেই সে বিষয়ে গবেষণামূলক সুচিন্তিত মতামত। মোগল রসুইখানায় ইলিশের অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা।... আমি এইসব কিছুই জানি না। আমি শুধু জানি বাংলা বর্ণমালার শিশুশিক্ষা বইয়ে 'অ'-তে হয় অজগর, 'আ'-তে আম, 'ই'-তে ইলিশ;... এই তথ্যই কি ইলিশ রান্না বিষয়ক একটি বইয়ের ভূমিকার জন্যে যথেষ্ট নয়?

প্রীতি-উপহার

বাসায় হঠাৎ এক পালকি উপস্থিত। সুন্দর করে সাজানো কাগজের রঙিন পালকি। পালকির দরজা খুলে দাওয়াতের চিঠি উদ্ধার করলাম, 'অমুক আপুর গায়েহলুদ। আপনি সবাইকে নিয়ে আসবেন।' ইত্যাদি।

সবকিছু বদলে দেবার জন্যে চারদিকে ভালো হৈচৈ শুরু হয়েছে। অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকেও দেখলাম নিজেকে বদলানোর জন্যে কাগজপত্রে দস্তখত করছেন। লোকমুখে শুনেছি তার বাসার কাজের ছেলেকে তিনি এখন দু'বেলা পড়ান। কাজের ছেলে চাকরি ছেড়ে পালিয়ে যাবার ধান্দায় আছে। তাকে ঘর থেকে বের হতে দেয়া হচ্ছে না। গ্রাজুয়েট হয়ে বের হবে, তার আগে না।

দেশ অবশ্যি নিজের নিয়মেই বদলাচ্ছে। পালকির ভেতরে নিমন্ত্রণপত্র তার প্রমাণ। নিমন্ত্রণের ধরন পাল্টাচ্ছে। বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান পাল্টাচ্ছে। আমার ছোটভাই আহসান হাবীবের কাছে শুনলাম, সে মাথায় টুপি পরে কোনো এক কুলখানিতে গিয়েছিল। সেখানে মিলাদের পরিবর্তে হঠাৎ করে মৃত ব্যক্তির প্রিয় গানের আসর বসল। আহসান হাবীব চট করে টুপি পাঞ্জাবির পকেটে লুকিয়ে ফেলল এবং গানের তালে তালে মাথা দোলাতে লাগল। আহসান হাবীব যেহেতু *উন্মাদ* নামক পত্রিকা চালায়, তার সব কথা বিশ্বাসযোগ্য না।

বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান কীভাবে বদলাচ্ছে সেই নিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করি।

আমার শৈশবে বিয়ে অনুষ্ঠানের প্রধান অনুসঙ্গ ছিল 'প্রীতি-উপহার' নামক এক যন্ত্রণা। কেন যন্ত্রণা বলছি তা ব্যাখ্যা করব, তবে তার আগে 'প্রীতি-উপহার' বিষয়ে বলি। বর-কনেকে আশীর্বাদ এবং বরণসূচক ছড়ার সংকলনই 'প্রীতি-উপহার'। সস্তা কোনো প্রেস থেকে এই জিনিস ছাপা হয়ে আসত। শুরুতে ছবি—মেহেদিপরা একটা হাত পুরুষের গরিলাটাইপ রোমশ হাতকে হ্যান্ডসেক করছে। কিংবা একটি কিশোরী পরী ফুলের মালা হাতে আকাশে উড়ছে। প্রীতি-উপহারের শুরুটা হত এইভাবে—

দোয়া মাগি তোমার হাতে ওগো দয়াময়
দুইটি প্রাণের মিলন যেন পরম সুখের হয়॥

এখন বলি কেন প্রীতি-উপহারকে আমি যন্ত্রণা বলছি। আমার বাবা তাঁর সমস্ত আত্মীয়স্বজনের বিয়েতে প্রীতি-উপহার দেয়া অবশ্যকর্তব্য মনে করতেন। রাত জেগে নিজেই লিখতেন। বিয়ের আসরে এই 'কাব্য' আমাকেই পাঠ করে শুনাতে হতো। পাঠ শেষে জনে জনে তা বিলি করা হতো। তারপর আমাকে প্রীতি-উপহার নিয়ে পাঠানো হতো মেয়েমহলে। কনেকে ঘিরে থাকত তার বান্ধবীরা। তারা তখন আমাকে নিয়ে নানান রঙ্গ-রসিকতা করত। আমি যথেষ্ট আবেগ নিয়ে প্রীতি-উপহার পড়ছি, এর মধ্যে কেউ একজন বলে বসল, 'এই বান্দর, চুপ কর।' মেয়েরা সবাই হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ত। আমি চোখ মুছতে মুছতে বিয়ের আসরে ফিরতাম।

এখনকার পাঠকরা কেউ যেন ভুলেও মনে না করেন, প্রীতি-উপহার কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। আমাদের এক আত্মীয়ার বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল, কারণ বরপক্ষ প্রীতি-উপহার আনে নি।

আরেকবার বরপক্ষের সঙ্গে কনেপক্ষের হাতাহাতি শুরু হলো। কারণ প্রীতি-উপহারে কনের বাবার নাম 'সালামে'র জায়গায় ছাপার ভুলে লেখা হয়েছে 'শালাম'। কনেপক্ষের ধারণা, ইচ্ছাকৃতভাবে কনের বাবাকে শালা ডাকা হয়েছে।

কবি শামসুর রাহমানের বিয়েতে প্রীতি-উপহার ছাপা হয়েছিল এবং দেশের কবিরা সবাই সেখানে লিখেছেন। এই তথ্য কি জানা আছে? যে সংকলনটি বের হয় তার নাম কবি শামসুর রাহমানই দেন। নাম 'জীবনের আশ্চর্য ফাল্গুন'। *সওগাত* সম্পাদক মোহম্মদ নাসির উদ্দিন তাঁর প্রেসে ছেপে দেন। [সূত্র: *বাংলাদেশের বিবাহ সাহিত্য*। আবদুল গাফফার চৌধুরী।]

প্রাচীনকালে বিয়ে কীভাবে হতো তা বললে পরিষ্কার বুঝা যাবে আমরা কতটা বদলেছি। বৈদিক যুগে কোনো তরুণীর বিয়ে একজনের সঙ্গে হতো না। তার সমস্ত ভাইদের সঙ্গে হতো। ঋগ্বেদে এবং অথর্ববেদে এমন কিছু শ্লোক আছে যা থেকে বুঝা যায় বড় ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে যৌনমিলনের অধিকার কনিষ্ঠ ভাইদেরও থাকত। এই দুই গ্রন্থেই স্বামীর ছোট ভাইকে বলা হয়েছে 'দেবৃ' অর্থাৎ দেবর। দ্বিতীয় বর।

বেদের জাতিত্ববাচক কয়েকটি শব্দ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, স্ত্রীলোকের অনেক স্বামী থাকত।

এর কারণও কিন্তু আছে। আর্যরা যখন এই দেশে ঢুকল, তখন তাদের সঙ্গে মেয়ের সংখ্যা ছিল খুবই কম। আর্যরা দেশি কৃষ্ণ রমণীদের প্রচণ্ড ঘৃণার চোখে দেখত। কাজেই তাদের সঙ্গে করে আনা মেয়েদের ভাগাভাগি করে গ্রহণ করা ছাড়া দ্বিতীয় বিকল্প ছিল না। [সূত্র: *ভারতের বিবাহের ইতিহাস*। অতুল সুর।]

রাহুল সাংকৃত্যায়নের বইতে পড়েছি, তিব্বতে সব ভাইরা মিলে একজন তরুণীকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করত। তিব্বতে মেয়ের সংখ্যা কম না, তারপরও এই অদ্ভুত নিয়মের কারণ হলো তিব্বতে জমির খুব অভাব। সব ভাই যদি আলাদা হয়ে সংসার শুরু করে, তাহলে জমি ভাগাভাগি হয়ে কিছুই থাকবে না। তিব্বতে যেসব মেয়ের বিয়ে হবে না তাদের গতি কী হবে? তারা মন্দিরের সেবাদাসী হবে। অর্থাৎ বেশ্যাবৃত্তি করবে। একবার মন্দিরের দেবতার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলে অন্য পুরুষদের সঙ্গে আনন্দ করতে বাধা নেই।

কী ভয়ঙ্কর!

DFP থেকে প্রকাশিত *সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকার নভেম্বর সংখ্যায় বিয়ের রীতিনীতি এবং ইতিহাস নিয়ে অনেকগুলি লেখা ছাপা হয়েছে। আমি পড়ে খুবই আনন্দ পেয়েছি। কৌতূহলী পাঠক সংখ্যাটি সংগ্রহ করে পড়লে আনন্দ পাবেন। সেখান থেকে 'উকিল বাপ' বিষয়ে লেখাটি তুলে দিচ্ছি।

ইসলামি শরিয়ত
'উকিল বাপ' প্রসঙ্গ

আমাদের দেশে মুসলিম রীতির বিয়েতে 'উকিল বাপ' পদবিধারী একজন ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। যারা বিয়েতে মেয়ের কাছ থেকে অনুমতি আনে এবং বিয়ের মজলিশে এসে মেয়ের সম্মতির কথা জানায়। এই উকিল বাপকে এতই গুরুত্ব দেয়া হয় যে, এটা না হলে বিবাহ হবে না বলে মনে করা হয় এবং পরবর্তীতে এই উকিল বাবাকে মেয়েরা নিজের বাবার মতো শ্রদ্ধা করে থাকে। তার নাম বিয়ের রেজিস্ট্রেশন ফরমেও তোলা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এই 'উকিল বাপ' ব্যক্তিত্বটি এমন একজন ব্যক্তি হয়ে থাকেন যার সাথে পিতৃতুল্য সম্পর্ক হওয়া সম্ভব নয় বা মেয়ের সাথে তার দেখা সাক্ষাৎ জায়েজ নয়। পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে মেয়েরা পদবি বিষয়টিকে বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন মনে করে না। এতে করে উভয়েই গোনাগার হয়ে থাকেন। মুসলিম রীতির বিয়েতে উকিল বাপ পদবিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে প্রচলিত হলেও বিষয়টি শরীয়তবিরোধী একটি প্রথা। কারণ শরীয়তে উকিল বাপের কোনো ধারণা নেই।

ইসলাম ধর্ম মতে, প্রতিটি মেয়ের জন্য পর্দা করা ফরজ হওয়ায় উকিল বাপ সম্পর্কটি হারাম বলে বিবেচিত হয়। মেয়ের কাছ থেকে অনুমতি নেয়ার জন্য তৃতীয় পক্ষ উকিল বাপের চেয়ে তার বাবা অথবা ভাইয়ের এ দায়িত্ব পালন করাই শ্রেয়।

[উপরিউক্ত ফতোয়া সংগ্রহ করা হয়েছে মুফতি মানসুরুল হক : ইসলামি বিবাহ, রাহমানিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ১৮-১৯ থেকে।]

আমি অনেক মেয়ের উকিল বাপ হয়েছি। এখন ঠিক করেছি আর না। উকিল দাদু হবার বিধান থাকলে অবশ্যি সেকেন্ড থট দেব।

একটি সংশোধনী

বিয়ের গান হিসেবে 'লীলাবালি লীলাবালি' গানটি প্রায়ই গীত হয়। আমাদের ছবি 'দুই দুয়ারী'তেও গানটি ব্যবহার করা হয়েছে। গানটি গাওয়া হয়—

লীলাবালি লীলাবালি
বড় যুবতী সই গো
কী দিয়া সাজাইমু তোরে ?

গানের কথায় ভুল আছে। 'বড় যুবতী' হবে না, হবে 'বর অযুবাতি'। এর অর্থ—বর আসছে।

আমার ভুলের কারণে এখন অন্যরাও ভুল করছেন। শেষে দেখা যাবে ভুলটাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। আদি ভুলের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আড্ডা

চলন্তিকা ডিকশনারিতে আড্ডার অর্থ দেয়া হয়েছে—'কুলোকের মিলনস্থান'। আমার 'দখিন হাওয়া'র বাসায় প্রায়ই আড্ডা বসে। অর্থাৎ কিছু কুলোক একত্রিত হন। আড্ডার প্রধান ব্যক্তিকে বলে আড্ডাধারী। আমি সেই জন। বাকিদের পরিচয় দিচ্ছি।

শাওন। (তার বাড়িতেই আড্ডা বসছে, সে যাবে কোথায় ?)

আলমগীর রহমান। (অবসর এবং প্রতীক প্রকাশনীর মালিক। আমার নিচতলায় থাকেন।)

আর্কিটেক্ট করিম। (তিনি আগে 'দখিন হাওয়া'তেই থাকতেন, এখন বিতাড়িত।)

মাজহারুল ইসলাম। (*অন্যদিন* পত্রিকার সম্পাদক-প্রকাশক, অন্যপ্রকাশ এবং অন্যমেলার স্বত্বাধিকারী। আমার পাশের ফ্ল্যাটেই থাকেন।)

কমল বাবু। (নাম কমল বাবু হলেও ইনি মুসলমান। মাজহারুল ইসলামের পার্টনার। শখের অভিনেতা। যে ক'টি নাটকে উপস্থিত তার প্রতিটি ডায়লগ মুখস্থ। কবিতা আবৃত্তির মতো তিনি ডায়লগ বলে আনন্দ পান।)

এঁরা আড্ডার স্থায়ী পাখি। সবসময় থাকেন। বেশ কিছু অতিথি পাখিও আছেন। এঁরা হঠাৎ হঠাৎ আসেন। যেমন চ্যালেঞ্জার, মাসুদ আখন্দ।

কিছু আছেন নিমন্ত্রিত পাখি। নিমন্ত্রণ করলে এঁরা আসেন। অনিমন্ত্রিতভাবে কখনোই উপস্থিত হন না। যেমন, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, শফি আহমেদ, আর্কিটেক্ট রবিউল হুসাইন...

প্রয়োজনের পাখিও আছে। তাঁদের উপস্থিত দেখলেই বুঝা যায় কোনোকিছুর প্রয়োজন হয়েছে। যেমন, অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর।

আমাদের এই আড্ডার একটি নামও আছে। Old Fools' Club. 'বৃদ্ধ বোকা সংঘ'। ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আড্ডার নাম 'বুধসন্ধ্যা'। তাঁরা প্রতি বুধবার বসেন। প্রধানত সাহিত্য নিয়ে কথাবার্তা হয়। রচনা পাঠ করা হয়।

আমাদের এখানেও রচনা পাঠ করা হয়। আমার একার রচনা। বৃদ্ধ বোকা সংঘে আমি ছাড়া লেখক কেউ নেই। তবে অত্যন্ত সুখের বিষয়, সাহিত্য নিয়ে কোনো আলোচনা হয় না। পরাবাস্তবতা, জাদুবাস্তবতা, কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনায় কোনো কৃষক চরিত্র নেই কেন—এ নিয়ে কোনো আলোচনায় কেউ যায় না। তাহলে আমরা কী করি?

শুরুর কিছুক্ষণ আমরা ঝিম ধরে থাকি। যাদের মোবাইল আছে, তারা মোবাইল টিপাটিপি করে। আলমগীর রহমান ঘনঘন হাই তোলেন এবং বলেন, শরীর ভালো লাগছে না। আজ যাই। মুখে বলেন, কিন্তু উঠেন না। কেউ তাকে থাকার জন্যে সাধাসাধিও করে না।

বাকি সদস্যরাও আলোচনা শুরুর বিষয় পান না। তারাও উসখুস করেন। তখন আড্ডাধারী হিসেবে আমার দায়িত্ব পড়ে আসর জমানোর। আমি নৌকার পাল তুলে দেই। জানি পাল তুললেই নৌকা চলা শুরু করবে। রাজনীতির কোনো প্রসঙ্গ তুলি। সবাই লুফে নেয়। তুমুল আলোচনা শুরু হয়ে যায়। বাঙালিরা হলো নাচুনি বুড়ি। আর রাজনীতি ঢোলের বাদ্য।

উদাহরণ দেই। আমি বললাম, আওয়ামী লীগের ডিজিটাল মন্ত্রীসভায় কিছু মন্ত্রী থাকা উচিত, যাদের কোনো দপ্তর থাকবে না। তাদের একটাই কাজ। তারা বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে শুধু টকশো করবেন।

করিম বলল, তাদের গাড়িতে কি ফ্ল্যাগ থাকবে?

আলমগীর বলল, অবশ্যই থাকবে। ডাবল ফ্ল্যাগ থাকবে। একটা আমাদের জাতীয় পতাকা, আরেকটা যে টিভি স্টেশনে টকশোতে অংশ নিতে যাচ্ছেন তাদের মনোগ্রামখচিত পতাকা।

কমল বলল, আর কিছু মন্ত্রী থাকবেন যারা শুধু সংবাদ সম্মেলন করবেন। আর কিছু না। তাদের টাইটেল, চিৎকারক মন্ত্রী।

আলোচনা জমে ওঠে। একটা পর্যায়ে শাওন হতাশ এবং দুঃখিত গলায় বলে, তোমাদের এই রাজনৈতিক আলাপটা কি বন্ধ করবে? এই আলোচনার কোনো ফলাফল কি আছে?

সমস্যা হচ্ছে আড্ডার কোনো আলোচনারই কোনো ফলাফল নেই। শুধু আড্ডা কেন, গোটা বাংলাদেশেরই আলোচনা, গোলটেবিল বৈঠক, চারকোনা টেবিল বৈঠক, চলমান গাড়ি বৈঠক সবই ফলাফল শূন্য। আমরা সবাই শূন্য আমাদের এই শূন্য রাজত্বে।

আড্ডায় মাঝে মাঝে গানের আসর বসে। শাওনের মুড ভালো থাকলে একের পর এক গান করতে থাকে। আবার অতিথি পাখি সাব-ইন্সপেক্টর টুটুল

(এস আই টুটুল) যখন আসে তখনো গান হয়। তবে সে এই আড্ডায় কখনো হুমায়ূন আহমেদের লেখা গান ছাড়া অন্য কোনো গান করে না। আবার শুনেছি যখন সে অন্য কোনো আড্ডায় যায়, তখন হুমায়ূন আহমেদকে ভাসুরের মতো দেখে। তার গান দূরে থাকুক, নামও উচ্চারণ করে না। হুমায়ূন আহমেদ বিষয়ক পরচর্চায়ও না-কি অনিচ্ছায় অংশগ্রহণ করে।

টুটুল শুধু যে গান চমৎকার করে তা-না। আড্ডাবাজ হিসেবেও সে অসাধারণ। তার মতো সুন্দর করে গল্প আর একজনই শুধু করতে পারে, তার নাম জাহিদ হাসান। আমাদের আড্ডায় সে অতিথি পাখি ক্যাটাগরিতে পড়ে। আরেকজন অতিথি পাখির নাম জুয়েল আইচ। আগে যখন ধানমণ্ডিতে থাকতেন, তখন প্রায়ই আসতেন। এখন প্রায় ভিসা নেবার দূরত্বে চলে গেছেন বলে তাঁর ক্যাটাগরি অতিথি পাখি থেকে বদলে হয়েছে নাই পাখি। তিনিও সুন্দর কথা বলেন এবং কথা বলতে পছন্দ করেন। তবে ইদানীং কথা বলায় তাঁর কিছু সমস্যা যাচ্ছে বলে আড্ডায় ঠিকমতো অংশ নিতে পারছেন না।

জুয়েল আইচ আড্ডায় উপস্থিত হওয়া মানেই ম্যাজিক—এই কথা আমাদের Old Fools' ক্লাবের জন্যে সত্যি না। আমাদের কয়েকটি নিয়ম আছে—আড্ডায় কোনো ম্যাজিশিয়ান এলে তাঁকে ম্যাজিক দেখাতে বলা যাবে না, কোনো ডাক্তার এলে রোগের বর্ণনা নিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া যাবে না, কোনো গায়ক এলেই বলা যাবে না, ভাই শুরু করুন তো। কেউ নিজ থেকে কিছু করতে চাইলে কোনো বাধা নেই।

জুয়েল আইচ আমাদের আড্ডায় নিজ থেকে কিছু অসাধারণ ম্যাজিক দেখিয়েছেন। তাসের একটা Closeup ম্যাজিক মানুষকে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও প্রতিবন্ধী অবস্থায় নিয়ে যায়।

আমাদের আড্ডার আরেকটি ক্যাটাগরি হচ্ছে Foreign পাখি। যেমন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার বা আগরতলার কবি রাতুল দেব বর্মন। তখন তাঁদের সম্মানে ঢাকা ক্লাব থেকে তরল খাবার আসে। বিদেশী পাখিরা তাঁদের কোমল শারীরবৃত্তীয় কারণে কঠিন খাবার সহ্য করতে পারেন না।

আমরা তখন মোটামুটি সচেতন আলোচনা করি। বেশির ভাগ সাহিত্য-বিষয়ক। যেমন 'নি' কেন শব্দের সঙ্গে ব্যবহার না করে আলাদা ব্যবহার করা হচ্ছে। 'নি' তো 'না'র মতো আলাদা শব্দ না।

একজন বলেন, নি এসেছে নাই থেকে, খাই নাই থেকে খাই নি। কাজেই আলাদা হবে।

আরেকজন বলেন, যেহেতু উচ্চারণ একসঙ্গে করা হয় কাজেই একসঙ্গেই হবে। আলাদা কখনোই হবে না।

কি এবং কী নিয়ে কথা ওঠে। দীর্ঘ ঈকার যখন আমরা উঠিয়েই দিচ্ছি তখন শুধু 'ক' বেচারার ওপর কেন এই হামলা?

আলোচনা কঠিন থেকে আরো কঠিনে চলে যায়। 'সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা কী' জাতীয় জটিলতা নিয়ে দার্শনিক কথাবার্তা। একসময় নৌকার হাল ফেরাবার জন্যে আমি বেমাক্কা কিছু কথা বলি। যেমন, আচ্ছা সুনীলদা, চর্যাপদে মৌরলা মাছের উল্লেখ আছে, কিন্তু ইলিশ মাছের উল্লেখ নেই; কেন বলুন তো?

বিদেশী পাখিদের উপস্থিতিতে আড্ডা শেষ হয় গানে। এই উপলক্ষে হায়ার করে অর্থাৎ পেটেভাতে কিছু গায়কও আনা হয়। যেমন, সেলিম চৌধুরী।

বিদেশী পাখিদের আড্ডায় আনার সবচেয়ে বড় সমস্যা, তাদের সঙ্গে থাকে ফেউ পাখি। আরো খারাপভাবে বললে সাহিত্যের মাছি। এইসব মাছির কাছে পশ্চিমবঙ্গের লেখক মানেই পাকা কাঁঠাল। তারা কাঁঠাল ঘিরে ভনভন করে উড়বেই।

সবচেয়ে মুশকিল হয়, যখন পশ্চিমা দেশের সাহেবরা এসে উপস্থিত হন। একজনের গল্প বলি। তিনি এসেছেন রাশিয়া থেকে। বাংলাদেশের রাশিয়ান অ্যাম্বাসিতে কাজ করেন। তিনি এসেছেন সাহিত্য নিয়ে আলাপ করতে। আমি হতাশ হয়ে আড্ডার বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললাম, মহাযন্ত্রণায় পড়লাম। এই রাশিয়াভসকির সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে কী ঘটর ঘটর করব?

রাশিয়ান হাসিমুখে পরিষ্কার এবং শুদ্ধ বাংলায় বলল, আমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ভালোমতো অধ্যয়ন করেছি, আপনি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে ঘটর ঘটর করতে পারেন। এই রাশিয়ান (পাভেল) আমার একটি উপন্যাস 'সবাই গেছে বনে'র রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

আড্ডাতে আরেক ধরনের উপস্থিতির কথা বলতে ভুলে গেছি। এঁরা আসেন তাদের বানানো ছবি বা টেলিফিল্ম দেখাতে কিংবা ছবির জন্যে গান রেকর্ড করেছেন তা শোনাতে। এঁদের উপস্থিতিতে নিয়মিত আড্ডা বাতিল হয়ে যায়। আড্ডাবাজরা জানীয় মতো মুখ করে ছবি দেখেন, টেলিফিল্ম দেখেন। ছবির গান শোনেন এবং গোপন দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

প্রয়াত লেখক প্রণব ভট্ট আড্ডায় যোগ দেবার আগে সবসময় খোঁজ নিতেন খাসির মাংসের কোনো ব্যবস্থা আছে কি-না। ব্যবস্থা থাকলে তিনি অবশ্যই আসবেন। দুর্ভাগ্য এই খাসির হাতেই তাঁর মৃত্যু হলো। আর্টারীতে চর্বি জমে হার্ট অ্যাটাক।

এদেশের লেখকদের মধ্যে ইমদাদুল হক মিলন প্রায়ই আসতেন। এখন টকশোতে অতি ব্যস্ত বলে আসতে পারেন না। আড্ডায় তাঁকে সবাই অত্যন্ত

পছন্দ করে, কারণ তিনি সবার সঙ্গে সব বিষয়ে একমত হন। আড্ডায় কেউ যদি বলে—রবীন্দ্রনাথ কোনো লেখকই না। ইমদাদুল হক মিলন বলবেন, একটা খাঁটি কথা সাহস করে বলেছেন। ধন্যবাদ। (মিলন এই লেখা পড়লে রাগ করবে। আরে বাবা, ঠাট্টা করলাম। তবে আনন্দের কথা মিলন এই লেখা পড়বে না। সে সেলিব্রেটি টকশো নিয়ে ব্যস্ত। কাঠপেন্সিল পড়ার তার সময় কোথায়? কাঠপেন্সিল সেলিব্রিটি না, পার্কার ফাউনটেন পেন হলেও কথা ছিল। হা হা হা।)

এখন আমাদের আড্ডার কিছু নিয়মকানুন বলি। সবই অলিখিত নিয়ম, তবে কঠিনভাবে মান্য করা হয়—

ক) কোনো খারাপ শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। উপস্থিত মহিলারা যেন কোনো অবস্থাতেই আহত না হন।

খ) পরচর্চা করা যাবে, তবে তা শুধু মজা করার জন্যেই এবং যার পরচর্চা করা হবে তাকে আড্ডায় উপস্থিত থাকতে হবে। তার অনুপস্থিতিতে না।

গ) আড্ডায় মনোমালিন্য কথা কাটাকাটি হতেই পারে। আড্ডা শেষ হওয়া মাত্র সব ভুলে যেতে হবে। আড্ডার ডেডবডি কেউ কাঁধে করে বাড়িতে নিয়ে যাবে না।

'দখিন হাওয়া'র এই আড্ডার সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক হলো, আড্ডায় যাদের উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে তারা কখনো কোনোদিনও তাদের স্ত্রীদের নিয়ে আসেন না। মাজহার যেহেতু পাশের বাসায় থাকে, তার স্ত্রী স্বর্ণা এসে মাঝে মধ্যে উঁকি দিয়ে স্বামীকে দেখে যায় এবং চোখের ইশারায় স্বামীকে উঠে যেতে বলে। মাজহার ভান করে সে চোখের ইশারা দেখে নি।

একমাত্র ব্যতিক্রম ঔপন্যাসিক মইনুল আহসান সাবের। তিনি আমাদের আড্ডায় কম আসেন, তবে বেশির ভাগ সময় তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আসেন।

মহিলারা কেন Old Fools' Club এড়িয়ে চলেন তা এখনো জানি না। মিসির আলি সাহেবকে কারণটা বের করতে বলেছি। তিনি চিন্তাভাবনা করছেন। সিদ্ধান্তে পৌঁছালেই আমি জানব।

কিছুদিন আগে আমাদের আড্ডা সম্পর্কে আমি একটি ভয়ঙ্কর তথ্য আবিষ্কার করেছি। বন্ধুদের বলেছি। সবাই একমত হয়েছেন। তথ্যটা আপনাদের জানাই।

তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই এমন কেউ যদি হঠাৎ এসে এই আড্ডায় আসক্ত হন, তাহলে বুঝা যাবে তাঁর দিন শেষ হয়েছে। ডাক এসেছে, তাঁকে চলে যেতে হবে। চারজনের উদাহরণ আমাদের কাছে আছে। তাঁদের নাম বলতে মন সায় দিচ্ছে

না। সর্বশেষ নামটা শুধু বলি। কেমিস্ট্রির দেলোয়ার ভাই। তিনি যাবেন ইউরোপ। রাত একটায় ফ্লাইট। তারপরেও কিছুক্ষণ আড্ডায় থাকার জন্যে তিনি টেলিফোন করেছিলেন। টেলিফোনে এটাই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ যোগাযোগ। ইউরোপ থেকে ফিরেই তিনি মারা গেছেন।

এখন হঠাৎ আড্ডায় যোগ দিয়েছেন নতুন একজন। আমার শৈশববন্ধু কঠিন মাওলানা সেহেরি। সন্ধ্যা মিলানোর পর তিনি ঘরে থাকতে পারেন না। যদি কোনো একদিন না আসেন আমি ভয়ে ভয়ে তাঁর বাসায় টেলিফোন করি। ভাবি টেলিফোন ধরেন। আমি বলি, ভাবি, সেহেরি কেমন আছে? তার কোনো সমস্যা নাই তো? শরীর ঠিক আছে?

ভাবি বলেন, বুড়া ভালো আছে। খাটে বসে বকরবকর করছে।

আমি বলি, শুনে শান্তি পেলাম ভাবি। পৃথিবীতে বকরবকর অবিনশ্বর। আর সবই নশ্বর। Silence is golden কথাটা মিথ্যা। Silence কখনোই Golden না।

যদ্যপি আমার গুরু

অল্প কিছুদিনের মধ্যে কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর নানান পত্রিকায় বেশ কিছু লেখা পড়েছি। উনার জন্মশতবার্ষিকী এক বছর আগেই শেষ হয়েছে। তার পরেও একটি পত্রিকা ঘটা করে জন্মশতবার্ষিকী পালন করল। তাতে আমি কোনো সমস্যা দেখি না। একজন বড় লেখককে সম্মান দেখানো হচ্ছে এটাই বড় কথা। আমাদের মধ্যে সম্মান করা এবং অসম্মান করার দুটি প্রবণতাই প্রবলভাবে আছে। কাউকে পায়ের নিচে চেপে ধরতে আমাদের ভালো লাগে, আবার মাথায় নিয়ে নাচানাচি করতেও ভালো লাগে।

একটা সময় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে নানান অসম্মানের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। তাঁকে 'বাকবাকুম' কবি বলা হয়েছে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এমএ পরীক্ষায় তাঁর রচনার অংশবিশেষ তুলে ধরে বলা হয়েছে—শুদ্ধ বাংলায় লিখ।

ভাগ্যিস উনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। বাঙালিকে তিনি মাথায় তোলার সুযোগ করে দিয়েছেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বিশেষ বক্তৃতামালা দেবার আমন্ত্রণ জানিয়ে ধন্য হয়েছে।

পশ্চিমা দেশেও (যাদের আমরা সভ্য বলে আনন্দ পাই) এরকম প্রবণতা আছে। তরুণ আইনস্টাইন চাকরি চেয়ে নানান বিশ্ববিদ্যালয়ে দরখাস্ত করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আবেদনের জবাব পর্যন্ত দেয় নি। আইনস্টাইন অতি বিখ্যাত হবার পর তাঁর চাকরির আবেদনগুলি বাঁধিয়ে অহঙ্কারের সঙ্গে প্রদর্শিত হচ্ছে। অহঙ্কারের বিষয় হলো, আইনস্টাইনের মতো লোক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির আবেদন করেছিলেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ফিরে যাই। তাঁকে সম্মান দেখানোর আতিশয্যে এক প্রবন্ধকার লিখেছেন, সস্তাধারার জনপ্রিয় লেখক শরৎচন্দ্রকে পেছনে ফেলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এগিয়ে গেছেন কত দূর। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা মানেই পরাবাস্তবতা, জাদুবাস্তবতা ইত্যাদি।

সমস্যা হচ্ছে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের স্বীকারোক্তি আছে তিনি শরৎচন্দ্রকে কতটা শ্রদ্ধার চোখে সারাজীবন দেখেছেন। গবেষক সরোজ মোহন

মিত্র তাঁর *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য* গ্রন্থে বলেছেন, 'মানিকের জীবনে শরৎচন্দ্রের প্রভাব ছিল অসীম।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' পড়ে অভিভূত ও বিচলিত হয়েছেন, তা লিখে গেছেন 'সাহিত্য করার আগে' নামের প্রবন্ধে।

বেচারা শরৎচন্দ্রের সমস্যা, তাঁর রচনা সব বাঙালি মেয়েরা চোখের জল ফেলতে ফেলতে পড়ে। আমাদের ধারণা বহুলোক যা পছন্দ করে তা মধ্যম মাত্রার হবে। কারণ বেশির ভাগ মানুষের মেধা মধ্যম মাত্রার।

বাংলা ভাষার ঔপন্যাসিকদের প্রচুর ইন্টারভিউ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একটি প্রশ্ন বেশির ভাগ সময়ই থাকে—আপনার প্রিয় ঔপন্যাসিক কে? প্রশ্নের উত্তরে কেউ কখনো শরৎচন্দ্রের নাম দেন না। হয়তো ভয় করেন এই নাম দিলে নিজে মিডিওকার খাতায় নাম উঠাবেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু কঠিন গলায় শরৎচন্দ্রের নাম বলতে দ্বিধা বোধ করেন নি। কারণ তিনি ভালোমতোই জানতেন তিনি যাই বলেন না কেন তাঁকে 'মিডিওকার' ভাবার কোনো কারণ নেই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আমি একটা লেখা শুরু করেছিলাম। কিছুটা লিখে থমকে গেছি। শুরুটা এরকম—

সেটেলমেন্ট বিভাগের দরিদ্র কানুনগো হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বমোট ১৪টি সন্তান। পঞ্চমটির নাম প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ছেলেটি পড়াশোনায় ভালো। প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিতে ডিসটিংশন নিয়ে প্রথম বিভাগে পাশ নিয়েছে। আইএসসিতে প্রথম বিভাগে পাশ করে অংকে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছে প্রেসিডেন্সি কলেজে।

হরিহর বাবু এবং তাঁর স্ত্রী নীরদা সুন্দরী দেবী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন এই ভেবে যে, পঞ্চমটির একটি গতি হয়ে গেল।

সমস্যা বাঁধাল প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু বন্ধু। একদিন ক্লাসের ফাঁকে তুমুল তর্ক। তর্কের বিষয় বড় কোনো কাগজে নবীন লেখকদের লেখা ছাপা নিয়ে। তারা বলছে, নবীন লেখকদের লেখা সম্পাদকরা পড়েনই না।

প্রবোধ একা বলছে, নবীনদের কোনো ভালো গল্প পায় না বলেই ছাপা হয় না। ভালো গল্প পেলেই ছাপবে।

অসম্ভব কথা।

আয় আমার সঙ্গে বাজি রাখ। আমি একটা গল্প লিখে পাঠাব। কোলকাতার সবচেয়ে ভালো পত্রিকা *বিচিত্রা*। *বিচিত্রাতেই* পাঠাব। তারা অবশ্যই ছাপবে।

তুই গল্প লিখবি?

বাজি জেতার জন্যে লিখব। আজ রাতেই লিখব।

অঙ্কের বই সরিয়ে রেখে রাত জেগে গল্প লেখা হলো। গল্পের নাম 'অতসী মামী'। লেখক হিসেবে প্রবোধ তাঁর ভালো নাম না দিয়ে মা তাঁকে যে নামে ডাকতেন সেই নাম দিলেন—মানিক।

পৌষ সংখ্যা *বিচিত্রায়* (ডিসেম্বর ১৯২৮) 'অতসী মামী' প্রকাশিত হলো। লেখকের নাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা কথাসাহিত্যের দিবাকর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাত্রা শুরু 'অতসী মামী'র হাত ধরে।

বিচিত্রা পত্রিকাতেই তাঁর আরো দু'টি গল্প প্রকাশিত হয়। তিনি অঙ্কের বই পুরোপুরি শেলফে তুলে লিখতে শুরু করেন প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য'।

সেবছরই তাঁকে কঠিন মৃগী রোগ কব্জা করে ফেলে। লেখার সময় Epilepsy-র আক্রমণ বেশি হয়। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকেন। একসময় জ্ঞান ফিরে, আবার লেখা শুরু করেন। ১৯৩৫ সনে মাত্র ২৭ বছর বয়সে লিখেন, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় 'পুতুলনাচের ইতিকথা' দিয়ে। পরিচয়ের ঘটনা বলা যেতে পারে। আমার বাবার পোস্টিং তখন বগুড়ায়। আমি বগুড়া জিলা স্কুলে ক্লাস টেনে পড়ি। সেখানকার পাবলিক লাইব্রেরির নাম উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরি। লাইব্রেরির অবৈতনিক সেক্রেটারি একজন উকিল। অল্পবয়েসীরা লাইব্রেরি থেকে কী বই নিচ্ছে না নিচ্ছে সেই দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর। আমার হাত থেকে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' তিনি কেড়ে নিয়ে বললেন, এই বয়সে মানিক না পড়াই ভালো। বইটা কঠিন। অশ্লীলতাও আছে।

আমি বললাম, বইটা আমি আমার পড়ার জন্যে নিচ্ছি না। বইটা বাবা পড়তে চেয়েছেন। তাঁর জন্যে নিচ্ছি। আমার জন্যে নিয়েছি 'সুন্দরবনের আর্জান সরদার'।

বই নিয়ে বাসায় ফিরলাম। সঙ্গে সঙ্গেই পড়তে শুরু করলাম। উপন্যাসের শুরুটা কী অদ্ভুত!

> খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া হারু ঘোষ
> দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে
> চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন।

এই শুরুটা পড়ে আমি কিন্তু বুঝতে পারি নি যে হারু ঘোষের ওপর বজ্রপাত হয়েছে। সে পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। উপন্যাসের কী আশ্চর্য শুরু এবং কী আশ্চর্য লেখা।

'পুতুলনাচের ইতিকথা' নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মোটামুটি কঠিন সমালোচনার মধ্যে পড়েন। কমিউনিস্টরা বললেন, মানিক বাবু মানুষকে পুতুল হিসেবে দেখছেন। নিয়তির হাতের পুতুল। তা হতে পারে না। মানুষই তাঁর নিয়তির স্রষ্টা। একজন লেখক সেই সত্যই লিখবেন। নিয়তির হাতে সব ছেড়ে দেবেন না।

যে যা বলে বলুক, আমার ধারণা বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির মধ্যে এটি একটি। উপন্যাসটি আমাকে কতটুক আচ্ছন্ন করেছে তার প্রমাণ দেই। আমার উপন্যাস 'শ্রাবণ মেঘের দিনে'র প্রধান চরিত্র কুসুম। এই কুসুম এসেছে পুতুলনাচের ইতিকথা থেকে। শশী ডাক্তারের প্রথমিনী। স্ত্রী শাওনকে আমি ডাকি কুসুম নামে। মনস্তাত্ত্বিকভাবে আমি তখন নিজেকে শশী ডাক্তার যে ভাবি না তা কে বলবে!

আমার মেজো মেয়ের নাম শীলা। এই নামটিও নিয়েছি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প 'শৈলজ শিলা' থেকে। গল্পের শেষে তিনি বলছেন—শৈলে যাহার জন্ম, শিলা যাহার নাম সে শিলার মতো শক্ত হইবে জানি কিন্তু রসে ডুবাইয়া রাখিলেও শিলা কেন গলিবে না ভাবিয়া মাথা গরম হইয়া উঠে।

তাঁর কোন লেখা কেমন, কোন গ্রন্থে জাদুবাস্তবতা আছে, কোনটিতে নেই, এইসব তাত্ত্বিক আলোচনায় যাব না। সাহিত্যের সিরিয়াস অধ্যাপকদের হাতে এই দায়িত্ব থাকুক। আমি ব্যক্তি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাচ্ছি।

নিঃসঙ্গ মানুষটার কোনো বন্ধু ছিল না। এতগুলি বই লিখেছেন, কাউকে কোনো বই উৎসর্গ করেন নি।

এই পর্যন্ত লিখে আমি থমকে গেলাম। অন্যদের মতো আমিও কি মানুষটাকে গ্ল্যামারাইজড করার চেষ্টা করছি না? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো বন্ধু নেই। একজন কাউকে পান নি বই উৎসর্গ করার জন্যে, এটা তো তাঁর ব্যর্থতা। কোনো অর্জন না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পড়াশোনা বাদ দিয়ে সাহিত্যে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করেন।—এই বাক্যটাতেও তাঁকে বড় করার প্রচ্ছন্ন চেষ্টা থাকে। মূল ঘটনা

সেরকম না। তিনি দু'বার B.Sc. পরীক্ষা দিয়ে ফেল করার পরই তাঁর ডাক্তার ভাই পড়াশোনার খরচ দেয়া বন্ধ করেন। বাধ্য হয়েই তাঁকে পড়াশোনায় ইতি টানতে হয়।

তাঁর কঠিন মৃগী রোগের চিকিৎসায় সেই সময়কার সবচেয়ে বড় চিকিৎসক এগিয়ে এসেছিলেন—ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়। তিনি তখন শুরু করেন মদ্যপান। এই সময় অতুল চন্দ্র সেনগুপ্তকে এক চিঠিতে লেখেন—

> ডাক্তারের সব উপদেশ মেনে চলা বা সব অষুধ নিয়মিত খাওয়া সম্ভব হয় নি। কারণ অর্থাভাব এবং অতিরিক্ত খাটুনি। আজ এখন অষুধ খেয়ে ঘুমোলে কাল হাঁড়ি চড়বে না। খানিকটা এলকোহল গিললে কিছুক্ষণের জন্যে তাজা হয়ে হাতের কাজটা শেষ করতে পারব। এ অবস্থায় এলকোহলের আশ্রয় নেয়া ছাড়া গতি কি?

খোঁড়া যুক্তি। যারা মদ্যপান করেন তারা জানেন এই জিনিস কাউকে তাজা করে না। আচ্ছন্ন করে। বোধশক্তি নামিয়ে দেয়।

আমার খুবই কষ্ট লাগে যখন দেখি এতবড় একজন যুক্তিবাদী লেখক নিজের জীবনকে পরিচালিত করেছেন ভুল যুক্তিতে।

তাঁর শেষ সময়ের চিত্র শরৎচন্দ্রের চরিত্রের চিত্রের মতো। তাঁর নিজের লেখা চরিত্রের মতো না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তখন আশ্রয় নিয়েছেন বস্তিতে। তাঁকে ঝাপ্টে ধরেছে চরম দারিদ্র্য, মদ্যপানে চরম আসক্তি এবং চরম হতাশা। তাঁকে দেখতে গেলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। অবস্থা দেখে তিনি গভীর বেদনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীকে বললেন, এমন অবস্থা! আগে টেলিফোন করেন নি কেন? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী অস্ফুট গলায় বললেন, তাতে যে পাঁচ আনা পয়সা লাগে ভাই।

১৯৫৬ সনের ডিসেম্বর মাসে বাংলা কথাসাহিত্যের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র মারা যান। তাঁর বয়স তখন মাত্র ৪৮।

'যদ্যপি আমার গুরু শুড়ি বাড়ি যায়
তদ্যাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।'

এই লেখাটির জন্যে প্রতীক ও অবসর প্রকাশনার আলমগীর রহমান নানান বইপত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

নুহাশ পল্লীতে হিমু উৎসব

কাউকে মুখের ওপর 'না' বলা আমার স্বভাবে নেই। না বলতে না-পারার অক্ষমতার খেসারত আমাকে নানানভাবে দিতে হয়। যেমন—

ক) চিনি না জানি না তরুণীর বিয়েতে উকিল বাবা।

খ) অপরিচিত শিশুর খৎনা অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি।

গ) নতুন লেখকের অখাদ্য উপন্যাসের ভূমিকায় লেখা— তরুণ ঔপন্যাসিকের গল্প বলার মুন্সিআনায় আমি বিস্মিত।

না বলতে না-পারার জটিল ব্যাধিতে যিনি আক্রান্ত তাকে দিয়ে ঢেঁকি বা রাইসমিল গেলানো তেমন কঠিন কর্ম না। কাজেই এক দুপুরে আমি দেখলাম যে নুহাশ পল্লীর হিমু উৎসব নামক রাইসমিল আমি গিলে বসে আছি।

কুড়িজন হিমু (এদের মধ্যে চারজন তরুণী হিমু) যাবে নুহাশ পল্লীতে। তারা সারাদিন সেখানে ঘুরবে। আমাকে হ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে। উদ্যোক্তা বাংলালিংক নামক টেলিফোন কোম্পানি। হিমুদের নিয়ে তারা একটি sms কনটেস্ট করেছে। পঞ্চাশ হাজারের মতো হিমু সেই কনটেস্টে অংশগ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে সেরা বিশজন যাবে নুহাশ পল্লীতে।

প্রতিটি দুষ্ট বুদ্ধির পেছনে একজন দুষ্টমান থাকেন। (বুদ্ধিমানের মতোই দুষ্টমান)। পুরো পরিকল্পনার দুষ্টমানের নাম ইবনে ওয়াহিদ বাপ্পি। সে একসঙ্গে অনেক কিছু করে—

কবিতা লেখে।
নাটক লেখে।
অভিনয় করে।
বই ছাপায়।
অ্যাড বানায়।
প্রয়োজন অপ্রয়োজনে জনসংযোগ করে।
উদ্ভট উদ্ভট আইডিয়া দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে।

বাপ্পির আইডিয়াতে হিমু উৎসবে রাজি হলাম। বাপ্পি বলল, স্যার, দেখার মতো দৃশ্য হবে। বিশজন হিমু মনের আনন্দে হলুদ পোশাক পরে খালিপায়ে নুহাশ পল্লীতে ছোটাছুটি করছে। হিমুর স্রষ্টা হিসেবে তাদের আনন্দ আপনি দেখবেন না?

আমি বললাম, আনন্দ দেখা যেতে পারে।

সে উৎসাহের সঙ্গে বলল, হিমু সঙ্গীত লিখে ফেলেছি। একটা অন্তরা শুধু বাকি। আশা করছি ঐদিন হিমু সঙ্গীত গীত হবে।

হিমু সঙ্গীতও আছে?

অবশ্যই। আমার মূল পরিকল্পনা জাতীয় পর্যায়ে হিমু দিবস পালন। অশোকের শিলালিপির মতো জায়গায় জায়গায় হিমুলিপি। হিমু পদযাত্রা।

আমি বললাম, সেটা আবার কী?

একদল খাঁটি হিমু তেতুলিয়া থেকে হাঁটতে হাঁটতে টেকনাফ যাবে। সেখান থেকে যাবে সেন্টমার্টিন। আপনার বাড়ি 'সমুদ্র বিলাস'-এ পৌঁছার পর পদযাত্রার সমাপ্তি। আপনিও আমাদের সঙ্গে থাকবেন। তবে আপনাকে হাঁটতে হবে না। আপনি থাকবেন গাড়িতে।

হিমু সঙ্গীত একটা অন্তরার অভাবে শেষ পর্যন্ত আটকে রইল। তবে কেন্দুয়া থেকে ইসলামুদ্দীন বয়াতী তার দলবল নিয়ে চলে এল এবং সকাল থেকে বাদ্যবাজনা শুরু হয়ে গেল—

নুহাশ পল্লীতে এসে আমরা
কী দেখিতে পাই?
চারদিকে ঘুরিতেছে
শত হিমু ভাই।
আহা বেশ বেশ বেশ
আহা বেশ বেশ বেশ॥
তাদের গায়ের জামা হলুদ রঙের হয়
পায়ে জুতা স্যান্ডেল কখনোই নয়।
আহা বেশ বেশ বেশ
আহা বেশ বেশ বেশ

এগারোটার দিকে টেলিফোন কোম্পানির গাড়ি ভর্তি করে হিমুদের দল চলে এল। অবাক হয়ে দেখি তাদের কারোর গায়েই হলুদ পাঞ্জাবি নেই এবং কারোর

পা খালি না। আমি বাপ্পিকে বললাম, ব্যাপার কী? এরা শুনেছি ভেজালবিহীন খাঁটি হিমু। এদের হলুদ পাঞ্জাবি কোথায়?

বাপ্পি মাথা চুলকে বলল, ব্যাপারটা আমিও বুঝতে পারছি না। আমার ধারণা ব্যাগে করে নিয়ে এসেছে। এখন পরবে।

আলোচনার শুরুতেই ছিল পরিচয়পর্ব। পরিচয়পর্বে দেখা গেল অর্ধেকের বেশি মফস্বলের হিমু। চাঁদপুরের হিমু, দিনাজপুরের হিমু। মফস্বলের হিমুদেরকে খানিকটা উগ্র বলেও আমার কাছে মনে হলো। তারা আমাকে জানাল যে, হিমু বিষয়ক সমস্ত বই তারা 'অধ্যয়ন' করেছে। একটি বিষয়ে তারা কোনো দিকনির্দেশনা পাচ্ছে না বলে চিন্তিত। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, কোন বিষয়ে?

হিমুদের কি প্রেম করার অধিকার আছে?

আমি জবাব দেবার আগেই অন্য হিমুরা কথা বলা শুরু করল। এবং তাদের কাছ থেকে জানলাম—

ক) হিমুরা আগ বাড়িয়ে প্রেম নিবেদন করতে পারবে না। তবে কোনো মেয়ে তাদের প্রেমে পড়লে তারা 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' নীতি অবলম্বন করবে।

খ) হিমুদের রূপা টাইপ প্রেমিকা একজন থাকতে পারে। তবে রূপার সঙ্গে (অর্থাৎ রূপা টাইপ প্রেমিকার সঙ্গে) কখনো দেখা করা যাবে না, তবে মোবাইলে কথা বলা যাবে এবং sms চালাচালি করা যাবে।

আলোচনার মাঝখানে একজন মফস্বল হিমুকে হঠাৎ বের হয়ে যেতে দেখলাম। মিনিট দশেক পর সে হলুদ পাঞ্জাবি, খালি পা এবং সানগ্লাস চোখে পরে উদয় হলো।

বাকি হিমুরা হৈহৈ করে উঠল, হিমুরা কখনো সানগ্লাস পরে না।

বেচারা সানগ্লাস খুলে মনমরা হয়ে একা ঘুরে বেড়াতে লাগল।

আধঘণ্টা পর নুহাশ পল্লীর ম্যানেজার চিন্তিতমুখে কানে কানে আমাকে বলল, খালি পায়ের হিমু ভাইয়ের মাথায় মনে হয় ক্র্যাক স্যার। উনি কিছুক্ষণ এক জায়গায় লাফিয়ে এখন কদম গাছের মগডালে উঠে কেমন করে জানি শুয়ে আছে। মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

আমি বললাম, তুমি আশেপাশে থাক। এবং যে-কোনো সময় যে-কোনো দুর্ঘটনার জন্যে তৈরি থাক।

ম্যানেজার চিন্তিতমুখে কদমগাছের দিকে ছুটে গেল।

অনুষ্ঠানের একটি পর্বে ছিল হিমুর স্রষ্টার সঙ্গে একান্তে কিছুক্ষণ।

এই পর্বে আমি সবার চোখের আড়ালে বসে থাকব। আমার সামনে একটা খালি চেয়ার থাকবে। হিমুরা একজনের পর একজন সেই চেয়ারে বসবে এবং একান্তে কথা বলবে।

আমি বাপ্পিকে বললাম, এই পর্বটা বাদ দাও। আমি হিমুদের ভাবভঙ্গির মধ্যে হঠাৎ প্রবল আউলাভাব লক্ষ করছি। কে কী করে বসে তার নাই ঠিক।

এই পর্ব বাদ গেল।

দু'জন হিমুকে দেখলাম অত্যন্ত উত্তেজিত। তারা বলছে, একটা হলুদ পাঞ্জাবি কিনলেই হিমু হওয়া যায় না। হিমু হওয়া সাধনার ব্যাপার। যুব সমাজের ভেতর এই সাধনার অভাব। বাংলাদেশে যত হিমু দেখা যাচ্ছে তার সবই ভেজাল। প্রতি পূর্ণিমাতে জোছনা দেখা হিমুদের জন্যে অবশ্যকর্তব্য, অথচ বেশির ভাগ হিমু পূর্ণিমা কবে তাই জানে না। হিমুদের জন্যে মিসির আলির বই পড়া নিষিদ্ধ। অথচ এখানে অনেক হিমু আছে যারা মিসির আলির বই পড়ে। এরা হিমু সমাজের কলঙ্ক।

হিমুদের যে মিসির আলির বই পড়া নিষিদ্ধ এই তথ্য আমি নিজেও জানতাম না। নতুন জ্ঞান পেয়ে ভালো লাগল।

মেয়ে হিমুদের একজন এসে বলল, স্যার, সোনার রঙ তো হলুদ। আমরা মেয়ে হিমুরা কি সোনার গয়না পরতে পারি?

আমি বললাম, অবশ্যই পরতে পার।

হলুদ শাড়ি পরলে মনে হয় কোনো গায়েহলুদের অনুষ্ঠানে যাচ্ছি। এর কী করব?

হলুদ পাঞ্জাবি পরলে হয় না?

না হয় না। তাহলে ছেলে হিমুদের সঙ্গে আমাদের তফাত কী থাকল?

টেলিফোন কোম্পানি হিমুদের জন্যে কিছু গিফটের ব্যবস্থা করেছিল। তার মধ্যে একটা করে মোবাইল ফোনের সেটও ছিল। হিমুরা সবাই আগ্রহ করে মোবাইল সেট নিল, যদিও হিমুদের বৈষয়িক আসক্তি থেকে মুক্ত থাকার কথা।

দুপুর আড়াইটায় খাবার দেয়া হলো। হলুদ রঙের খাবার— খিচুড়ি। আমি প্রচণ্ড মাথা ধরেছে এই অজুহাতে হিমুদের কাছ থেকে বিদায় চাইলাম।

তারা বলল, শুরু রেস্ট নিন। আপনার রেস্টের প্রয়োজন আছে।

খুব হালকাভাবে লেখাটা লিখলাম। লেখাটা আরেকটু গুরুত্বের সঙ্গে লেখা উচিত ছিল। পৃথিবীতে কাল্টের (Cult) বিষয়টি প্রবলভাবেই আছে। কিছু মানুষের

জিনের ভেতরই হয়তোবা Cult সদস্য হবার বিষয় থাকে। গুরুর নির্দেশে এরা করতে পারে না এমন কাজ নেই।

কাল্টের সংজ্ঞা হচ্ছে, ক্ষুদ্র একদল মানুষ যারা গুরুর পেছনে সীমাহীন আবেগে একত্রিত হয়। শ্রীলঙ্কার প্রভাকরণকে এক অর্থে Cult গুরু বলা চলে। তালেবানরাও তাই। জাপানে এক প্রায় অন্ধ Cult গুরুর (Shoko Asahara) আদেশে বহু মানুষকে Serin গ্যাস দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনা ১৯৯৫ সনের। এই গুরুর দলের নাম Aum Shinrikyo. দলের সদস্যরা গুরুকে দেখত ঈশ্বরের মতো।

জিম জোনস (James Warren Jim Jones)-এর ঘটনা তো সবার জানা। ১৭ নভেম্বর ১৯৭৮ সনে তার কারণে ৯০০ মানুষ স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে।

হিমু নামের যে গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে এরা অবশ্যই নির্বিষ, ভেজিটেবল টাইপ। তবে এদেরকে কখনোই একত্রিত হতে দেয়া যাবে না। সব কাল্ট সদস্য একসময় নির্বিষ ভেজিটেবল থাকেন।

পাদটিকা

রাশিয়ার মস্কো শহরে একটি হিমু ক্লাব হতে যাচ্ছে। ক্লাবের সদস্যরা বাঙালি না, রাশিয়ান। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের ছাত্রছাত্রী। এরা হিমুকে নিয়ে লেখা কয়েকটি বই রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছে। বইগুলির প্রকাশনা উৎসবেই ক্লাব তৈরির ঘোষণা দেয়া হবে। উৎসবে আমন্ত্রিত সব অতিথিকে হলুদ রঙের কিছু পরতে হবে। অতিথিদের বড় অংশ ডিপ্লোমেট। তাদের জন্যে ৫০টা হলুদ টাই কেনা হয়েছে।*

* সূত্র : বাংলাদেশে রুশ দূতাবাসের এক তরুণ কর্মকর্তা, গাছেল। সে নিজেও নাকি একজন হিমু।

বিপদ-আপদ

বিপদের সঙ্গে সবসময় আপদ শব্দটি যুক্ত হয়। আপদ একটি স্ত্রীবাচক শব্দ। অনেক বিপদ স্ত্রীলোক নিয়ে আসে বলেই কি আপদ ? আমরা বলি 'আপদ জুটেছে'। এর অর্থ নিশ্চয়ই বিপদ নিয়ে আসবে এমন এক মহিলা কপালে জুটে গেছে।

আমার দীর্ঘ জীবনে অনেক আপদের মুখোমুখি হয়েছি। তারা স্ত্রীলোক হিসেবে যেমন এসেছে পুরুষ হিসেবেও এসেছে। কিছু গল্প করা যেতে পারে।

শহীদুল্লাহ হলে থাকি। হাউস টিউটর। এক ছুটির দিনে আপদ জুটে গেল। ড্রয়িংরুমে গোঁফওয়ালা এক যুবক বসা, গাট্টাগোট্টা শরীর। অতি গম্ভীর। নাম বাহাদুর। সে লেখক স্যারের সঙ্গে দেখা না করে বিদায় হবে না। প্রয়োজনে চব্বিশ ঘন্টা ঠায় বসে থাকবে।

আমি আপদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সে অতি বিনয়ে কদমবুসি করতে করতে বলল, আপনাকে একটা উপহার দিতে এসেছি। উপহার গ্রহণ করলে খুশি হব। নিতেই হবে।

আমি বললাম, উপহারটা কী ?

আমার একটা কিডনি।

আমি বললাম, আমার দু'টা কিডনি সচল, তোমাটার আমার প্রয়োজন পড়ছে না।

যদি কখনো প্রয়োজন পড়ে সে-কারণে জানিয়ে রাখলাম। স্যার, আপনি ধরে নিন আপনারই একটা কিডনি আমার শরীরে। যখন খবর পাব দিয়ে যাব। নো ডিলে।

আচ্ছা যাও প্রয়োজন হলে খবর দেব। এখন যাও, কাজ করছি।

বাহাদুর বলল, মাঝে মাঝে আমি খোঁজ নিয়ে যাব কিডনির প্রয়োজন পড়ল কি না।

আমি বললাম, তোমাকে এসে খোঁজ নিতে হবে না। ঠিকানা রেখে যাও, কিডনি নষ্ট হলেই খবর দেব।

যুবক বলল, আমার কোনো স্থায়ী ঠিকানা নেই। একেক সময় একেক জায়গায় থাকি। আমিই এসে খোঁজ নিয়ে যাব।

আমাকে বলতে হলো, আচ্ছা।

আমার জীবনে উপগ্রহের মতো আপদ জুটে গেল। সে অদ্ভুত অদ্ভুত সময়ে এসে খোঁজ নেয় আমার কিডনির কোনো সমস্যা আছে কি না। সে যে নিজের কিডনির খুব যত্ন নিচ্ছে সেটা জানাতেও ভোলে না।

স্যার, চা-সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি। এতে কিডনির ক্ষতি হতে পারে। নিয়মিত ব্যায়াম করছি। দৈনিক সাত গ্লাস পানি খাচ্ছি। আপনাকে তো একটা খারাপ জিনিস দিতে পারি না। ... আপনার ব্লাডগ্রুপ কী? আমার ও-পজিটিভ।

ব্লাডগ্রুপ জানি না।

ব্লাডগ্রুপ জেনে রাখবেন স্যার। কিডনির ম্যাচিং-এ লাগে।

এই কিডনিওয়ালাকে আমি একবার চাকরিও দিয়েছিলাম। তিন মাস সে নুহাশপল্লীতে চাকরি করেছে। এখন অনেকদিন তার খোঁজ নেই। তার জিম্মায় থাকা আমার কিডনির খবর কী কে জানে!

দ্বিতীয় আপদের কথা বলি। এই আপদ স্ত্রীলোক। আঠারো-উনিশ বছরের তরুণী। বাড়ি চিটাগাং। ঘটনাটা বলি।

কী কারণে যেন চিটাগাং গিয়েছি। উঠেছি এক হোটেলে। আমার কলিজিয়েট স্কুলের বন্ধু ওমপ্রকাশ (সে নিজেও লেখালেখি করে) আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বলল, দোস্ত হিন্দু বিয়ে কীভাবে হয় দেখবে? আজ আমার এক আত্মীয়ার বিয়ে হচ্ছে।

আমি বললাম, হিন্দু বিয়ে অনেকবার দেখেছি। আর না। হিন্দু বিয়েতে পুতুলখেলা টাইপ কিছু বিষয় আছে। আংটি খোঁজাখুঁজি। এইসব আমার পছন্দ না।

ওমপ্রকাশ বলল, দোস্ত যেতেই হবে। মেয়ে তোমার বিরাট ভক্ত। রাতে তোমার বই পাশে না নিয়ে ঘুমাতে পারে না। বাসর রাতে তোমার কোন বই পাশে থাকবে তাও ঠিক করা।

আমি বললাম, কোন বই?

ওমপ্রকাশ বলল, আমি জানি না। তুমি জিজ্ঞেস করে জেনে নিও।

এরপর না বলা শুধুমাত্র মহান লেখকদের পক্ষেই সম্ভব। আমি যেহেতু

বাজারি লেখক (লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের হিসাবে) কাজেই রাজি হয়ে গেলাম। বাসর রাতে মেয়েটির পাশে কোন বইটি থাকবে জানতে ইচ্ছা করছে।

কমিউনিটি সেন্টারে বিয়ে হচ্ছে। মেয়ে সেজেগুজে সবার সামনে স্টেজে বসা। কোনো পুরোহিত বা এই জাতীয় কিছু দেখলাম না। মনে হচ্ছে হিন্দু বিয়ে এখন অনেক আধুনিক হয়েছে।

ওমপ্রকাশ আমাকে মেয়েটির কাছে নিয়ে গেল। সেই মেয়ে যেহেতু কোনো লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে যুক্ত না, আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। আমাকে তার পাশে ছবি তোলার জন্যে বসতে হলো। সে দুই হাতে আমার হাত শক্ত করে চেপে ধরে বলল, তার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত সে এই হাত ছাড়বে না।

আমি হকচকিয়ে গেলাম। কারণ মেয়েটির মধ্যে হিস্টিরিয়ার সব লক্ষণ প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। বিয়ের উত্তেজনায় এবং অনাহারে (বিয়ের দিনে হিন্দু মেয়েদের না খেয়ে থাকতে হয়) সে মানসিক এবং শারীরিকভাবে দুর্বল। অতি সাধারণ চাপ সহ্য করার শক্তিও তার নেই।

এর মধ্যে বরযাত্রী চলে এল। এবং বরপক্ষের একজন এগিয়ে এসে বলল, কন্যা আরেক পুরুষের হাত ধরে বসে আছে কেন? এই পুরুষ কে?

ওমপ্রকাশ ভীত গলায় বলল, উনি বিখ্যাত লেখক। উনার নাম হুমায়ূন আহমেদ। রেবা (মেয়ের নাম) তাঁর বিশেষ ভক্ত।

বরকর্তা বললেন, বিশেষ ভক্ত হলে তার বই পড়বে। তার হাত ধরে বসে থাকবে কেন? অন্য কোনো ঘটনা অবশ্যই আছে। এই বিয়ে হবে না। আমরা ফেরত যাচ্ছি।

রেবা অজ্ঞান হয়ে এলিয়ে পড়ে গেল। তার হাতের মুঠি আলগা হলো। আমি উঠে দাঁড়ালাম। কাউকে যে কিছু বলব সেই উপায় নেই। ততক্ষণে ধুন্ধুমার শুরু হয়েছে। বরপক্ষ এবং কনেপক্ষের মধ্যে তুমুল তর্কাতর্কি। কয়েকজনকে দেখলাম হাত গুটাচ্ছে।

ওমপ্রকাশ আমাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে পরিস্থিতি সামলাতে গেল।

পরে খবর নিয়েছি, বিয়ে লগ্নমতোই হয়েছে। এই শর্তে হয়েছে যে, মেয়ে কোনোদিন হুমায়ূন আহমেদ নামক লেখকের নাম উচ্চারণ করতে পারবে না এবং তাঁর কোনো বই পড়তে পারবে না।

দুই দেশী আপদের গল্প বললাম, এইবার বিদেশী আপদের গল্প। এই আপদ পুরুষ। বয়স ৩৬/৩৭, সুইডেনের নাগরিক। নাম মাসুদ আখন্দ।

সে সুইডেনে বেশ ভালো বেতনের সরকারি কর্মকর্তা। ছুটি কাটাতে দেশে এসেছে। তার ইচ্ছা একদিন সে সারাক্ষণ আমার সঙ্গে থাকবে। আমি কী করি না করি দেখবে। কথা বলে আমাকে বিরক্ত করবে না। আমার সঙ্গে সারাদিন থাকার একটি বিশেষ কারণও নাকি তার আছে।

আমি বললাম, কারণটা কী?

সে বলল, জীবনের একটা পর্যায়ে আমরা চরম দুঃসময়ের ভেতর দিয়ে গিয়েছি। তখন আপনার বই পড়ে আমরা শক্তি ও সাহস পেয়েছি।

আমার বইয়ের যে শক্তি এবং সাহস দেয়ার ক্ষমতা আছে এই তথ্য জানতাম না। আমি বললাম, আমি নুহাশপল্লীতে যাচ্ছি। চল আমার সঙ্গে সারাদিন থাকবে।

সে সারাদিন থাকল। সন্ধ্যাবেলা বলল, স্যার, আমি বাকি জীবন আপনার পাশে থাকতে চাই। নানানভাবে আপনার সেবা করতে চাই। আপনার কাজকর্ম খানিকটা হলেও সহজ করতে চাই। সুইডেনে আমার গাড়ি আছে। আমি ভালো গাড়ি চালাই। আপনি ড্রাইভার বিদায় করে দিন। আপনার গাড়ি আমি চালাব।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, এ হলো বিদেশী আপদ। এর হাত থেকে অতিদ্রুত মুক্তি না পেলে সমস্যা আছে। আমি বললাম, আমি আমার নাটক এবং ছবির কাজে টেকনিক্যাল লোকজনের সাহায্য নেই। ক্যামেরাম্যান, এডিটর এইসব। সেই যোগ্যতা তোমার নেই। যদি কোনোদিন যোগ্যতা হয় তখন দেখা যাবে। এখন বিদায়।

তিন বছর পর (চার বছরও হতে পারে) এই যুবক আবার উপস্থিত। আমাকে পা ছুঁয়ে সালাম করে হাসিমুখে বলল, স্যার, আমাকে চিনতে পারছেন?

আমি বললাম, না।

আমার নাম মাসুদ আখন্দ। এখন চিনেছেন?

না।

যুবক আহত গলায় বলল, স্যার, আপনার সঙ্গে বাকি জীবন থাকার জন্যে আমি টেকনিক্যাল কাজ শিখেছি। সুইডিশ ফিল্ম ইন্সটিটিউট থেকে এডিটিং, স্পেশাল এফেক্ট এবং ডিরেকশনে ডিগ্রি নিয়েছি।

আমি মনে মনে বললাম, খাইছে আমারে! প্রকাশ্যে বললাম, এখন তোমাকে চিনেছি। তোমার সরকারি চাকরির কী হলো?

চাকরি ছেড়ে দিয়েছি স্যার।

বাকি জীবন বাংলাদেশে থাকবে?

অবশ্যই। বাংলাদেশে থাকব এবং আপনাকে সাহায্য করব।

তোমার স্ত্রী-ছেলেমেয়ে বাংলাদেশে আসতে রাজি হবে?

স্ত্রী রাজি না হলে ডিভোর্স দিয়ে চলে আসব।

মাসুদ আখন্দ তার স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়ে এখন বাংলাদেশে আছে। তার স্ত্রীর ধারণা হুমায়ূন আহমেদ নামক লেখকের কারণে তাদের সুখের সংসার ভেঙে গেছে।

মাসুদকে আমি আমার প্রতিষ্ঠানে যুক্ত করি নি। তাকে বলেছি নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে। যেদিন আমার সত্যিকারভাবেই তাকে প্রয়োজন পড়বে সেদিন ডাকব। যখন পুরোপুরি চলৎশক্তিহীন হব তখন আমাকে বিছানা থেকে বাথরুম নেয়া-আনার পবিত্র দায়িত্ব সে পাবে। এই মহান দায়িত্ব অন্য কাউকেই দেয়া হবে না।

মাসুদ আখন্দ বিপুল উৎসাহে বাংলাদেশে তার কার্যক্রম শুরু করেছে। Fishbone Films নামের একটি প্রতিষ্ঠান করেছে, যেখানে ভিডিও নাটক এবং ফিল্ম তৈরি হবে। একটি নাটক (উড়াল ফানুস) সে তৈরিও করেছে। নাটকটা আমাকে দেখানোর মতো উন্নতমানের হয় নি বলে আমাকে দেখাচ্ছে না। অন্যদের দেখিয়ে বেড়াচ্ছে।

আমার শুভ কামনা তার প্রতি এবং তার প্রতিষ্ঠানের প্রতি। প্রার্থনা করি একদিন তার প্রতিষ্ঠান নুহাশ চলচ্চিত্রকে ছাড়িয়ে অনেক দূর যাবে। পরাজয় অতি দুঃখজনক ঘটনা। শুধু ছাত্র এবং পুত্রের কাছে পরাজয় গৌরবময়।

মাসুদ আখন্দ নামক কঠিন আপদকে আমি ছাত্র এবং পুত্রের মতোই দেখি। পরম করুণাময়ের করুণা তার ওপর শ্রাবণধারার মতো বর্ষিত হোক। এই শুভ কামনা।

একটি ভ্রমণ কাহিনী

নুহাশ পল্লী ছাড়া আর কোথাও যেতে আমার ভালো লাগে না। নতুন দেশ দেখা, নতুন জনপদ দেখা আমাকে আকর্ষণ করে না। নিজের দেশই দেখা হয় নি, অন্য দেশ কী দেখব?

মাঝে মাঝে অ্যান্টার্কটিকায় যেতে ইচ্ছা করে। জনমানবশূন্য ধুধু বরফের দেশ দেখতে ইচ্ছা করে। বরফের ঘর ইগলুতে একটা রাত কাটানো। রাতের আকাশে মরুপ্রভার খেলা দেখা।

সমস্যা হচ্ছে অ্যান্টার্কটিকায় বইমেলা হয় না। সেখানে লেখকদের সাহিত্য নিয়ে জটিল জ্ঞানের কথা বলার সুযোগ নেই।

এই সুযোগ আছে নর্থ আমেরিকায়। নিউইয়র্কের 'মুক্তধারা'র বিশ্বজিৎ প্রতিবছর বইমেলার আয়োজন করে। ফোবানা বলে বাংলাদেশের বাঙালিরা বৎসরের এক সময় একত্রিত হয়। অনুষ্ঠান শেষ হয় মারামারি এবং চেয়ার ছোড়াছুড়িতে। শুনেছি ফোবানা দুই ভাগে এখন বিভক্ত। আওয়ামী লীগ ফোবানা এবং বিএনপি ফোবানা। দেশের সংস্কৃতি বিদেশে আমরা নিতে পারি বা না-পারি, দেশের দলাদলি ঠিকই 'Import' করছি।

ভারতীয় বাঙালিরাও বৎসরে একবার সম্মেলন করেন। নাম 'বঙ্গ সম্মেলন'। সেখানে তাঁরা বাংলাদেশের কিছু অতিথিকে নিমন্ত্রণ করেন।

আমার দুর্ভাগ্য যে প্রতিবছরই সবক'টি সম্মেলন থেকে আমি নিমন্ত্রণ পাই। দুর্ভাগ্য বলছি, কারণ নিমন্ত্রণের কারণে আমাকে বেশ কিছু মিথ্যা বলতে হয়। যেমন, ভিসা পাই নি বলে যেতে পারছি না। (ভিসার জন্যে অ্যাপ্লাই-ই করি নি। ভিসা পাব কীভাবে?)

ডাক্তার বলেছে হার্টের অবস্থা ভালো না। এক মাসের জন্যে কমপ্লিট বেড রেস্টের ব্যবস্থা দিয়েছেন।

ভার্টিগো সমস্যা হচ্ছে। প্লেনে উঠেই অসুস্থ হয়ে পড়ি। বমি টমি করে একাকার।

এতকিছু করেও এ বছর শেষ রক্ষা হয় নি। আমি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে শুকনা মুখে প্লেনে উঠলাম। নিউইয়র্কে বিশ্বজিতের বইমেলা। সানফ্রানসিসকোতে বঙ্গ সম্মেলন। এইখানেই শেষ না, নিউজার্সিতে আরেক মেলা।

কেউ ভুলেও ভাববেন না ঐসব অনুষ্ঠানে লেখকদের নিয়ে বিরাট মাতামাতি হয়। ঝোঁকটা থাকে নাচ-গানের দিকে। লেখকরা শোভা হিসেবে থাকেন। লেখকদের শুকনা বক্তৃতা শোনার জন্যে আগ্রহ থাকার কারণও অবশ্যি নেই।

বিশ্বজিতের বইমেলায় তিনজন লেখক—হাসান আজিজুল হক, সমরেশ মজুমদার এবং আমি। অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন হাসান ফেরদৌস। গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠান শুরু হলো। আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার দু'বছর বয়েসী পুত্র মঞ্চে উঠে এসে ঝাঁপ দিয়ে আমার কোলে উঠে পড়ল। তার মা'র একক গানের অনুষ্ঠান আছে। সে সঙ্গীতযন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত। পুত্র নিষাদ এই সুযোগ গ্রহণ করেছে।

অনুষ্ঠান সঞ্চালকের কঠিন কঠিন প্রশ্নের জবাব আমি পুত্রকে কোলে নিয়ে দিচ্ছি। একই সঙ্গে পুত্র নিষাদের প্রশ্নের জবাবও দিতে হচ্ছে। তার প্রশ্নগুলি সহজ। যেমন, মা কোথায় গেল? তোমার ঠান্ডা লাগছে?

নিউইয়র্কের বামেলা শেষ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এই মেলায় আমার একটি প্রাপ্তিও ছিল। জীবনের প্রথম পুত্রকে কোলে নিয়ে স্টেজের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে তার মা'র গান শুনলাম। দর্শকদের অনুরোধে সে গাইল, 'যদি মন কাঁদে তুমি চলে এসো এক বরষায়।' গান শেষ করে শাওন জানতে চাইল, গানটি কার লেখা আপনারা কি জানেন?

শ্রোতাদের একজন বলল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। আমার পাশে বাচ্চাকোলে আরো এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি গলা নামিয়ে বললেন, এটা নজরুল গীতি। আমি যথেষ্ট আত্মশ্লাঘা অনুভব করলাম, কারণ এই গানটির গীতিকার আমার অতি পরিচিত। তাঁর সাথে রোজই আমার দেখা হয়। ভদ্রলোক ভালো মানুষ টাইপ।

জায়গাটার নাম San Johe, উচ্চারণ সেন হোজে। ক্রিশ্চিয়ান সেইন্টের নামে নাম। বঙ্গ সম্মেলন হচ্ছে হোটেল হিলটনের কনভেনশান সেন্টারে। লোকে লোকারণ্যের মতো দাদায় দাদারণ্য। আমি কাউকে চিনি না। তারাও আমাকে চেনেন না। একজন এসে বললেন, নমস্কার। আপনি কি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন?

আমি বললাম, জি।

রুনাদির সঙ্গে এসেছেন ?

আমি বললাম, শাওনদির সঙ্গে এসেছি।

তিনি বললেন, আপনি কি রুনাদির গানের সঙ্গে তবলা বাজাবেন ?

আমি বললাম, আপনারা বললে অবশ্যই বাজাব। কিন্তু আমি তো তবলা বাজাতে পারি না।

দু'জনই দু'জনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আমি তখনো বুঝতে পারি নি রুনাদি হচ্ছেন রুনা লায়লা।

হিলটন খুবই নামিদামি হোটেল। কিন্তু হোটেলের বাইরে বেমানান সস্তা ধরনের বেঞ্চ পাতা। এই বেঞ্চে বসে বিরস মুখে সিগারেট টানছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। পরিচিত মুখ দেখা যাচ্ছে। আমি এগিয়ে গেলাম।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বললেন, কোনো মানে হয় হুমায়ূন! সিগারেট খাবার জন্যে প্রতিবার নয়তলা থেকে নেমে হোটেলের বাইরে আসতে হয়। সিগারেট যে পুরোপুরি খারাপ তাও তো না। এর কিছু ভালো দিকও আছে।

আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, ভালো দিক কী ?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বললেন, সিগারেটের ৯৮টা দোষ। দু'টা মাত্র গুণ। ভালো গুণ দু'টা হলো যারা সিগারেট খায় তাদের আলজেমিয়ার্স হয় না। এবং বৃদ্ধ বয়সে তাদের হার্ডিড বেঁকে যায় না।

আমি বললাম, আপনার সঙ্গে শাওনের দেখা হলে এই দু'টা ভালো গুণের কথা বলবেন, বিপদে আছি।

বঙ্গ সম্মেলনে আছেন তিন লেখক। সুনীল, সমরেশ, হুমায়ূন। সাহিত্যের জটিল সেমিনার। কঠিন সব প্রশ্ন। একেকটা প্রশ্নের জবাব দেই আর মনে মনে বলি, 'এইসব সেমিনারে আর আসবি ? গাধা তোর শিক্ষা হয় না ?'

গোদের ওপর ক্যাপারের মতো সিনেমা-সেমিনারেও আমাকে অংশগ্রহণ করতে হলো। কারণ আমার দু'টা ছবি তারা দেখাচ্ছে– ক. আমার আছে জল। খ. চন্দ্রকথা।

'আমার আছে জল' আমি নিজেও দর্শকদের সঙ্গে বসে কিছুক্ষণ দেখলাম। একজন মহিলা দর্শকদের মন্তব্য উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না। তিনি পাশের জনকে বললেন, দিদি! বাংলাদেশের এই পরিচালক কিন্তু পানি বলছেন না। জল বলছেন। ছবির নাম 'আমার আছে জল'। 'আমার আছে পানি' নাম দেন নি। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ গো। এমনটা দেখা যায় না।

এই জাতীয় সম্মেলনে ভিডিও ক্যামেরা হাতে কিছু সাংবাদিক থাকেন। তারা ইন্টারভিউ নিয়ে বেড়ান। তাদের একজন আমার মুখের ওপর ক্যামেরা ধরে বললেন, দাদা, তসলিমার দেশে ফেরার ব্যাপারে কী করলেন ?

আমি বললাম, ভাই দেশ তো আমি চালাচ্ছি না। আমি দেশ চালালে অবশ্যই তাকে দেশে ফিরতে বলতাম। বাংলাদেশের মেয়ে কেন অন্য দেশে নির্বাসিত জীবনযাপন করবে ?

দাদা, এটা কি আপনি মন থেকে বলছেন ?

আমি বললাম, লেখকরা মিথ্যা গল্প তৈরি করেন, সেটাকে ব্যালেন্স করার জন্যেই সবসময় সত্যি কথা বলতে হয়।

পাদটিকা

বঙ্গ সম্মেলনে তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে একটা কবিতা সংকলন বের হয়েছে। সংকলনটির নাম 'লজ্জার এক বৎসর'। সুন্দর সুন্দর কিছু কবিতা সেখানে আছে। বিশেষ করে কবি জয় গোস্বামীর কবিতাটা তো খুবই ভালো লাগল।

তসলিমা নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন। ব্যাপারটা কষ্টের। দেশের মেয়ে কেন বাইরে থাকবে ? তিনি ভুলভ্রান্তি যদি করে থাকেন তার ফয়সালা দেশেই হবে। বাংলাদেশে এমন কেউ কি আছে যে ভুলের উর্ধ্বে ? দেশ মা তার সব সন্তানকে বুকে ধরে রাখতে চান। রাজনীতিবিদরা এই কথা কেন বুঝেন না ?

মা

আমেরিকানরা রসিকতা করতে পছন্দ করে। তাদের রসিকতার বিষয় শাশুড়ি, মা না। আমাদের দেশে ব্যক্তি নিয়ে রসিকতা শালা-দুলাভাই, দাদা-নাতিতে সীমাবদ্ধ। মা-শাশুড়ি কিংবা বাবা-শ্বশুর কখনো না।

আমার মা রসিক মানুষ। তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে রসিকতা করেন। কাজেই তাঁকে নিয়ে তাঁর ছেলেমেয়েদেরও রসিকতা করার অধিকার আছে। মা'র রসিকতার নমুনা দেই।

একবার এক অপরিচিত মহিলা মা'কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ছেলে কয়টি ?

মা বললেন, তিনটি।

বড় ছেলে কী করে ?

মা বললেন, সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তার পিএইচডি ডিগ্রি আছে কেমিস্ট্রিতে।

ভদ্রমহিলা : মাশাল্লাহ। মেজোটি কী করে ?

মা : সে সিলেটের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তার একটা পিএইচডি ডিগ্রি আছে ফিজিক্সে।

ভদ্রমহিলা : মাশাল্লাহ। তিন নম্বর ছেলেটি কী করে ?

মা : সে উন্মাদ।

ভদ্রমহিলা : আহারে, কী সর্বনাশ! সবচেয়ে ছোটটা উন্মাদ ?

মা : সে 'উন্মাদ' না। সে উন্মাদ নামে একটা পত্রিকা বের করে।

ভদ্রমহিলা হতভম্ব। তাঁর সঙ্গে রসিকতা করায় খানিকটা রাগ। মা নির্বিকার।

আমি তখন 'অচিন রাগিনী' নামের তিন খণ্ডের একটা নাটক বানিয়েছি। মা আমার বাসায় বেড়াতে এসেছেন। নাটক আমার সঙ্গে দেখবেন। তিনি আগ্রহ নিয়ে নাটক দেখলেন। আমি বললাম, কেমন লাগল ?

মা বললেন, তোর নাটক দেখতে দেখতে একটা কথা মনে হলো। তোর বাবা আগেভাগে মারা গিয়ে তোর জন্যে সুবিধা করে দিয়েছে।

আমি বললাম, কী রকম ?

মা বললেন, সে ছিল নাটকপাগল। তোর নাটকে আসাদুজ্জামান নূর যে পার্টটা করেছে, এটা সে করার জন্যে তোকে বলত। তুই পার্ট তাকে দিতি না। এই নিয়ে পিতাপুত্রের মন কষাকষি। সমস্যা না ? আগেভাগে মারা যাওয়ায় তুই বিরাট বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছিস।

এইবার মা'কে নিয়ে আমার রসিকতার গল্প। বাবার পোস্টিং তখন কুমিল্লায়। পুলিশের ডিএসপি। আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। ছুটিতে কুমিল্লায় গিয়ে দেখি মা মুরগি পুষছেন। তিনটা মুরগি। মুরগি ডিম পাড়বে। ঐ ডিম খাওয়া হবে। প্রতিদিন সকালে মা খাঁচা খুলে আগ্রহ নিয়ে দেখেন মুরগি ডিম পাড়ল কি না। প্রতিদিন তাকে হতাশ হতে হয়। আমি গোপনে ডিম কিনে এনে রাতে খাঁচায় রেখে দিলাম। সকালে ঘুম ভাঙল মা'র আনন্দ-চিৎকারে। তিনটা মুরগি একসঙ্গে ডিম দিয়েছে। এরপর থেকে প্রতিদিনই খাঁচায় তিনটা করে ডিম পাওয়া যেতে লাগল। সবাই খুশি। একদিন মা'র আনন্দ-ধ্বনি শোনা গেল না। অথচ আমি রাতে তিনটা ডিমই রেখেছি। তিনি ডিম হাতে আমার কাছে এসে বললেন, এইসব কী! মা'র সঙ্গে ফাজলামি ?

আমি বললাম, কী করেছি ?

মা বললেন, এই তিনটা তো হাঁসের ডিম। মুরগি তো হাঁসের ডিম পাড়বে না।

আমি বললাম, মা ভুল হয়েছে। এরকম আর করব না।

মা এই ঘটনায় খুবই আহত হলেন। বাবার কাছে নালিশ করলেন। বাবা আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে যমের মতো ভয় পাই। ভয়ে অস্থির হয়ে তাঁর কাছে গেলাম। বাবা বললেন, মুরগির ডিমের বদলে তুই হাঁসের ডিম কিনলি কী মনে করে ?

আমি বললাম, মুরগির ডিমই চেয়েছি। ডিমওয়ালা হাঁসের ডিম দিয়েছে।

বাবা বললেন, সবচেয়ে ভালো হতো পচা ডিম রাখল। তোর মা ডিম ভাঙত, বিকট গন্ধে বাড়ি ভরে যেত। তিনটা মুরগি একসঙ্গে পচা ডিম কেন পাড়ল—এই নিয়ে আমরা তখন গবেষণায় বসতাম।

পাঠক, আমার বাবার রসবোধ কি ধরতে পারছেন ?

মানুষ যেমন রসিকতা করে প্রকৃতিও কিন্তু করে। সেই রকম একটা গল্প বলি। মা'র প্রতি প্রকৃতির রসিকতা।

মা তখন খুবই অসুস্থ। কিডনি প্রায় অকেজো। বিছানায় বসে থেকেই ঘুমিয়ে পড়েন। ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না। একদিন হঠাৎ অচেতন হয়ে গেলেন।

অ্যাম্বুলেন্স এনে তাঁকে ল্যাব এইড হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। তাঁকে CCU-তে রাখা হলো। ডাক্তার বলেন চক্রবর্তীর রোগী। তাঁর জ্ঞান ফিরল রাত তিনটায়। তিনি দেখলেন, সবুজ পর্দা ঘেরা একটা ঘরে তিনি শুয়ে আছেন। আরামদায়ক আবহাওয়া। তাঁর সামনে সবুজ পোশাক পরা দু'টি রূপবতী (এবং বেঁটে) তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। [এরা নার্স। মা'র খোঁজ নিতে এসেছিল।]

মা'র ধারণা হলো তিনি মারা গেছেন। মৃত্যুর পর তাঁর বেহেশত নসিব হয়েছে। কারণ বেহেশত সবুজ, এই খবর তিনি জানেন। মেয়ে দু'টি যে হুর এটাও বুঝা যাচ্ছে। নিশ্চিত হবার জন্যে তিনি হুরদের জিজ্ঞেস করলেন, মা এটা কি বেহেশত ?

হুর দু'জন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে রোগীকে সন্তুষ্ট করার জন্যে বলল, জি খালাম্মা।

মা বললেন, তোমরা আমাকে বেহেশতের আঙ্গুর এনে দাও তো। খেয়ে দেখি কী অবস্থা।

হুর দু'জন আঙ্গুর নিয়ে এলে কী হতো আমি জানি না। তার আগেই ডিউটি ডাক্তার ঢুকলেন এবং বললেন, খালাম্মার জ্ঞান ফিরেছে। আপনার ছেলেমেয়েরা সবাই বাইরে আছে। ডেকে দেই কথা বলেন।

এই ঘটনার পর একদিন মা'কে বললাম, আপনার কি খুব বেহেশতে যাবার ইচ্ছা ?

মা বললেন, হ্যাঁ।

আমি বললাম, আপনি তো লোভী মহিলা না। বেহেশতের লোভ কেন করছেন ?

মা বললেন, বেহেশতে না গেলে তোর বাবার সঙ্গে তো দেখা হবে না। তোর বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্যেই বেহেশতে যেতে চাই।

আমি বললাম, প্রথম দেখাতে তাঁকে কী বলবেন ?

বলব, ছয়টা ছেলেমেয়ে আমার ঘাড়ে ফেলে তুমি চলে গিয়েছিলে। আমি দায়িত্ব পালন করেছি। এদের পড়াশোনা করিয়েছি। বিয়ে দিয়েছি। এখন তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করবে। বেহেশতের সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলি আমাকে দেখাবে। শুধু আমরা দু'জন ঘুরব। তুমি তোমার সঙ্গের হুরগুলিকে বিদায় কর।

মৃত্যু একটি ভয়াবহ ব্যাপার। যখন মা'কে দেখি সেই ভয়াবহ ব্যাপারটির জন্যে তিনি আনন্দ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, তখন অবাক লাগে।

রসকষ

ছোটবেলায় একটা খেলা খেলতাম। এই খেলায় অতি দ্রুত একটি ছড়া আবৃত্তি করতে হতো—

রস
কষ
সিঙ্গাড়া
বুলবুলি
মস্তক

একটি শব্দের সঙ্গে অন্যটির কোনো মিল নেই। ননসেন্স রাইম যেরকম হবার কথা সেরকম। শুধু প্রথম দু'টি শব্দ সবসময় একসঙ্গে ব্যবহার করার রীতি আছে। যেমন, 'লোকটির রসকষ নেই'। ব্যাপারটা এরকম যার রস থাকবে তার কষও থাকতে হবে। রসবোধের সঙ্গে কষবোধ।

আমরা রসিক মানুষ পছন্দ করি। শৈশবে দেখেছি গ্রাম্য মজলিশে ভাড়া করে রসিক মানুষ নিয়ে আসা হতো। তাদের কাজ হাসিতামাশা করে আসর জমিয়ে দেয়া। নেত্রকোনা অঞ্চলে এদের নাম 'আলাপি' অর্থাৎ যিনি আলাপ করেন। শৈশবে আলাপিদের আলাপ শুনেছি। তাদের আলাপের বড় অংশ জুড়েই আদি রস। কাজেই শিশুদের জন্যে নিষিদ্ধ।

বাংলাদেশের মেয়েরাও মনে হয় স্বামী হিসেবে রসিক পুরুষ পছন্দ করে। 'কী ধরনের স্বামী পছন্দ ?' প্রশ্নের জবাবে দেখি একটা সাধারণ উত্তর হলো, তাকে রসিক হতে হবে। রসবোধ থাকতে হবে।

আমার আড্ডার আড্ডাধারিরা সবাই রসিক। রসিকতা করেন এবং বুঝতেও পারেন। বাসায় আড্ডা চলছে আর কিছুক্ষণ পর পর হো হো হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে না তা কখনো হয় না। যারা নিয়মিত আড্ডায় আসেন না তারাও ভালো কোনো রসিকতা পেলে sms করে আমাকে পাঠিয়ে দেন।

সম্প্রতি এরকম একটি sms পেয়েছি। যিনি পাঠিয়েছেন তিনি গুরুগম্ভীর মানুষ। পরিচয় প্রকাশ করে তাঁর গাম্ভীর্যে কালো স্পট ফেলার অর্থ হয় না বলেই

নাম অপ্রকাশিত। রসিকতাটা বলা যাক।

ইন্ডিয়াতে 'গে' সমাজ (সমকামী সমাজ) স্বীকৃতি পেয়েছে। তার প্রভাব পড়েছে দরজিদের ওপর। কেউ ট্রাউজার বানাতে গেলে দরজি বলছে, স্যার জিপার কি শুধু সামনে হবে? নাকি পেছনেও হবে?

রসিকতার উৎপত্তি কোথায় হয় এই বিষয়টি কিন্তু রহস্যাবৃত। একই ধরনের রসিকতা পৃথিবীর সব দেশে, সব কালচারে প্রচলিত। কে প্রথম শুরু করেছে তা কেউ জানে না।

সায়েন্স ফিকশনের গ্র্যান্ডমাস্টার আইজাক অ্যাসিমভের এই বিষয়ে একটি থিওরি আছে। তিনি বলেন, 'রসিকতার' জন্ম পৃথিবীর বাইরে। এলিয়েনরা এগুলি তৈরি করে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়। মানুষ রসিকতাগুলি কীভাবে গ্রহণ করে তা দেখে তারা মানব সমাজ সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে চায়। তবে তাৎক্ষণিক রসিকতা মানুষই তৈরি করে।

এখন একটি তাৎক্ষণিক রসিকতার গল্প বলি। আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পৃথিবীর নানান দেশের লেখকরা উপস্থিত হয়েছেন। আমিও সেই দলে আছি। ক্রিয়েটিভ রাইটিং-এর ওপর একটা সেমিনার হচ্ছে। বক্তা চমৎকার বলছেন। হঠাৎ লেখকদের একজন (ইন্দোনেশীয় ঔপন্যাসিক) হাত তুললেন।

বক্তা হঠাৎ বক্তৃতা বাধাগ্রস্ত হওয়ায় খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, কী জানতে চাচ্ছেন?

ঔপন্যাসিক বললেন, সেমিনার কক্ষে কয়েকটা মশা উড়তে দেখেছি। আমি জানতে চাচ্ছি, মশা কামড়ালে কি AIDS হয়?

বক্তা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক এই প্রশ্নের জবাবে বললেন, মশা কামড়ালে AIDS হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে তুমি যদি মশার সঙ্গে যৌনসঙ্গম কর তাহলে হতে পারে।

আমি বক্তার তাৎক্ষণিক রসিকতায় মুগ্ধ। ইন্দোনেশীয় ঔপন্যাসিকের ভোতামুখের ছবি এখনো চোখে ভাসে।

শুরুতে বলেছি আমরা রসিক মানুষ পছন্দ করি। কিন্তু বাংলাদেশে রসিক মানুষদের কিছু সমস্যা আছে। তারা সমাজে হালকা মানুষ বলে বিবেচিত হন। ময়মনসিংহ অঞ্চলে এদের আলাদা নাম আছে, 'কিচক'। কিচক হলো ভাঁড়।

ক্রিয়েটিভ মানুষরা নিপাতনে সিদ্ধর মতো সবসময় রসিক হন। তাঁরা তাদের রসবোধ বন্ধুবান্ধবের বাইরেও (তাদের সৃষ্টিতে) ছড়িয়ে দেন। 'জননী' মানিক বন্দোপাধ্যায়ের প্রথমদিকের একটি উপন্যাস। উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের

মদ্যপানের অভ্যাস। তার একটি ছেলে হয়েছে খবর পেয়ে সে বাড়িতে ছেলে দেখতে এল। ছেলে কোলে নিয়ে বলল, 'যমজ হয়েছে না কি গো? দু'টা কেন?'

রবীন্দ্রনাথের তাৎক্ষণিক রসিকতা নিয়ে কয়েকটি বই আছে। পাঠকরা পড়লে মজা পাবেন। আমাদের কবি নির্মলেন্দু গুণের রসবোধ তুলনাবিহীন। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে নিজের অজান্তেই আমি হো হো করে হাসার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলি।

বিজ্ঞানীরাও এক অর্থে ক্রিয়েটিভ মানুষ। তারা কি রসিকতা করেন? বিজ্ঞানীরা সিঙ্গেল ট্র্যাক মানুষ। সিঙ্গেল ট্র্যাক মানুষরা রসিকতা করেন না, বুঝেনও না। তাদের মধ্যে ধর্ম প্রচারকের আলাদা গাম্ভীর্য থাকে। তাঁরা মনে করেন বিজ্ঞাননামক ধর্ম তাঁরা প্রচার করছেন। উজ্জ্বল ব্যতিক্রম পদার্থবিদ George Gamow. ইনি ১৯৪৮ সনে বিগ ব্যাং-এর প্রমাণ হিসেবে মহাকাশে Background Radiation পাওয়া যাবে বলে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। দু'জন বিজ্ঞানী Background Radiation আবিষ্কার করেন। তাদের নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

যে কথা বলছিলাম, পদার্থবিদদের সমাজে জর্জ গ্যামোকে জোকার হিসেবে ধরা হতো। কারণ তিনি সারাক্ষণই নাকি 'জোকারি' করতেন। তার 'জোকারি'র একটা নমুনা হচ্ছে, তিনি পদার্থবিদ্যার অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি গবেষণা তাঁর এক বন্ধুর নাম দিয়ে জার্নালে প্রকাশ করে দেন। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হলো, এই কাজটি কেন করলেন? তিনি হাসতে হাসতে বললেন, বন্ধুকে চমকে দেবার জন্যে। সে মাথা চুলকাবে আর ভাববে এই কাজটি কখন করলাম?

আমাদের সমাজে ভাঁড় মানে, ছোট জাত। তাদের কথাবার্তায় মজা পাওয়া যাবে, তবে তাদেরকে পাত্তা দেওয়া যাবে না। কারণ তারা এক অর্থে বেয়াদব। মুরুব্বিদের সামনে শব্দ করে হেসে ফেলাকে বেয়াদবি ধরা হতো। নববধূ স্বামীর ঘর করতে যাবার আগে তাকে যেসব উপদেশ দেয়া হতো তার মধ্যে একটি হচ্ছে—শ্বশুর-শাশুড়ির সামনে কখনো শব্দ করে হাসবে না। যদি হেসে ফেল লক্ষ রাখবে দাঁত যেন দেখা না যায়। শ্বশুর-শাশুড়িকে দাঁত দেখানো বিরাট বেয়াদবি।

চিটাগাং কলেজিয়েট স্কুলে যখন পড়তাম তখন আমাদের এক অংক শিক্ষকের কাছে ক্লাসে হেসে ফেলার জন্যে কঠিন শাস্তি পেয়েছি। আমি একা না, অনেকেই। এই স্যার আবার তাৎক্ষণিক রসিকতায় অসম্ভব পারদর্শী। ছাত্রদের এমন সব কথা বলতেন যে হেসে না ফেলে উপায় ছিল না। হাসলেই বিপদ। স্যারের হুঙ্কার, এটা কি রঙ্গশালা? হাসল কে? কানে ধরে উঠে দাঁড়াও। বকের

মতো দাঁড়াও এক ঠ্যাং-এ। তোমার নাম কালাম। আজ থেকে নামের আগে বগা টাইটেল। সবাই একে ডাকবে বগা কালাম।

স্যারের কথায় হাসি আসছে, কিন্তু হাসতে পারছি না। এ এক কঠিন অবস্থা। কঠিন বড় বাথরুম চেপেছে, বাথরুমে যেতে পারছি না টাইপ।

স্যারের অন্য ধরনের একটা গল্প বলি। তখন মার্বেল খেলায় আমার খুব ঝোঁক ছিল। একটা ক্ষয়ার এঁকে ক্ষয়ারের এক কোনায় মার্বেল রাখা হতো। সেই মার্বেলকে সই করে মারতে হতো। খেলায় ক্ষয়ারের একটা ভূমিকা ছিল। কী ভূমিকা তা মনে নেই। মগ্ন হয়ে খেলছি, হঠাৎ দেখি অংক স্যার। আমি আতঙ্কে জমে গেলাম। স্যার বললেন, এখানে কী করছিস ?

মার্বেল খেলছি স্যার।

মার্বেল খেলছিস ? থাপড়ায়ে তোর দাঁত সবগুলো ফেলে দেব। বত্রিশটা দাঁত পকেটে নিয়ে বাসায় যাবি। আয় আমার সঙ্গে।

আমি ভয়ে অস্থির হয়ে স্যারের সঙ্গে গেলাম। স্যার একটা টিনের হাফ বিল্ডিং-এ ঢুকলেন এবং ডাকলেন 'জমিলা' বা এই ধরনের কিছু। স্যারের নাম এবং তাঁর স্ত্রীর নাম মনে পড়ছে না। অল্পবয়েসী এক তরুণী বের হয়ে এলেন। স্যার বললেন, এ আমার ছাত্র। এদের আমি সবসময় বকাঝকা করি। তুমি একে কোলে নিয়ে আদর করে দাও। এতে সমান সমান হবে। ঘরে কোনো খাবার থাকলে খেতে দাও।

ক্লাস ফাইভে যে ছেলে পড়ে সে অনেক বড়। স্যারের বালিকা বধূ তারপরেও টেনে আমাকে কোলে তুললেন। লজ্জিত গলায় বললেন, ঘরে তো কিছু নাই। স্যার বললেন, কোলে নিয়ে বসে থাক। আমি গরম জিলাপি নিয়ে আসি। গরম জিলাপি পুলাপানের পছন্দ। এই বলেই তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, গাধা গরম জিলাপি খাবি ?

আমি বললাম, খাব।

ঝিম ধরে কোলে বসে থাক, আমি জিলাপি নিয়ে আসছি।

পৃথিবীর অনেক প্রাণী extinct হয়ে যাচ্ছে। তাদের রক্ষার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা শৈশবে যেসব শিক্ষক পেয়েছি তাঁরাও extinct হয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের রক্ষার কোনো চেষ্টা নেই।

বোথাম সাহেবের বই

আমি যখন ফাইভ-সিক্সে পড়ি তখন বাজারে প্রথম কোকাকোলা, ফান্টা আসা শুরু হলো। তারপর এল 7Up। এর আগে সোডাওয়াটার পাওয়া যেত। বোতলের মুখ মার্বেল দিয়ে বন্ধ থাকত। বোতল ভালোমতো ঝাঁকালে কার্বন ডাই অক্সাইডের চাপে বন্দুকের গুলির মার্বেল ছুটে যেত। বড়ই মজার খেলা।

যাই হোক, প্রথমদিন 7Up খেয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। এর নাম সেভেন আপ কেন ? নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। কারণটা কী ? শৈশবের কৌতূহল সহজে যায় না। যাকে পাই তাকেই জিজ্ঞেস করি। কেউ বলতে পারে না। ওপরের ক্লাসের এক বড় ভাই বললেন, এটা খেলে সাতবার ঢেঁকুর ওঠে। কাজেই সেভেন আপ নাম। এরপর থেকে পয়সা জমাতে পারলেই সেভেন আপ কিনি। খেয়ে ঢেঁকুর ওঠে। তিনটা, বড়জোর চারটা ঢেঁকুর ওঠে। এর বেশি না।

কয়েকদিন আগে হঠাৎ করেই সেভেন আপ নামকরণের তাৎপর্য জানতে পেরেছি। পাঠকদের জানাচ্ছি। এই জ্ঞানে তাদের কোনো উপকার হবার কথা না। তারপরেও জানা রইল।

সাত এসেছে সাত আউন্স থেকে। প্রথম যে 7Up-এর বোতল ছাড়া হয়েছিল তাতে সাত আউন্স পানীর ধরত। Up হলো বুদবুদ কোন দিকে উঠবে তার নির্দেশনা।

শৈশবের একটি কৌতূহল মিটল জীবনের শেষ দিকে। আমার কাছে ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অসংখ্য অমীমাংসিত প্রশ্ন নিয়ে বড় হই। একসময় অমীমাংসিত প্রশ্ন নিয়ে কবরে চলে যাই।

সম্প্রতি আমার হাতে দু'টা বই এসেছে। একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর, লেখক আইজাক অ্যাসিমভ। নাম *Book of Facts*। অন্যটির নাম *The Book of Useless Information*। লেখক নোয়েল বোথাম। দু'টি বইতেই মজার মজার সব তথ্য।

উদাহরণ দেই। জীবন্ত কবর দিয়ে দেওয়া হবে এই ধরনের ভীতি নাকি কিছু মানুষের মধ্যে কাজ করে। এই ভীতির নাম Taphephobia. এই ভীতির কথা

আমি প্রথম আমার মা'র কাছে শুনলাম। তিনি এক সন্ধ্যার মাগরেবের নামাজের পর আমাকে ডেকে বললেন, প্রায়ই একটা কথা ভেবে আমার খুবই ভয় লাগে।

আমি বললাম, কী নিয়ে ভয় লাগে?

মা বললেন, তোরা যদি আমাকে মৃত মনে করে জীবন্ত কবর দিয়ে ফেলিস। হঠাৎ অন্ধকার কবরে জ্ঞান ফিরল। তখন আমি করব কী? এরকম ঘটনা যে ঘটে না, তা তো না। ডেডবডি নিয়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎ ডেডবডি নড়ে উঠল।

আমি বললাম, এই বিষয়টা নিয়ে কী করা যায় তা আমরা পারিবারিক মিটিং বসিয়ে ঠিক করব। আপনি এ নিয়ে একেবারেই চিন্তা করবেন না।

Book of Useless Information পড়ে দেখি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের এই ভীতি ছিল। প্রবলভাবেই ছিল। তিনি উইল করে গিয়েছিলেন যে মৃত্যুর পরে পরেই তাকে কবর দেওয়া যাবে না। তিন দিন অপেক্ষা করতে হবে। দেখতে হবে তিনি আসলেই মারা গেছেন কিনা।

বইটি থেকে কিছু মজার তথ্য জানাচ্ছি।

প্রাণীজগৎ

ক. পৃথিবীর ৮০ ভাগ প্রাণীর পা ছয়টি।

খ. ব্যাঙ তরল খাদ্য এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস তনের চামড়া দিয়ে নেয়। মুখে না।

গ. ছোট্ট একটা ব্যাঙ হজম করতে একটা সাপের ৫২ ঘণ্টা সময় লাগে।

ঘ. মানুষদের জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি গরিলাদের ক্ষেত্রেও কাজ করে।

ঙ. একটি জোকের মস্তিষ্কের সংখ্যা হলো বত্রিশ।

চ. পোলিও রোগের ধরন বুঝার জন্যে ত্রিশ হাজার বাঁদরের ওপর পরীক্ষা চালানো হয়েছিল।

খাবারদাবার

ক. আদি কোকাকোলার রঙ ছিল সবুজ।

খ. কেচাপ (Ketchup) এর জন্ম চীন দেশে।

গ. পটেটো চিপস প্রথম তৈরি হয় আমেরিকার লুসিয়ানাতে, ১৮৫৩ সনে।

ঘ. পৃথিবীর সবচেয়ে ঝাল মরিচের নাম Habanero।

পাঠক কি হাই তুলতে শুরু করেছেন? আমার বড় সমস্যা হলো আমার যা ভালো লাগে তা সবাইকে জানাতে ইচ্ছা করে। একটা সময় ছিল প্রতি পূর্ণিমায়

একদল বন্ধুবান্ধব নিয়ে নুহাশ পল্লীতে পূর্ণিমা দেখতে যেতাম। বন্ধুরা সে হা করে পূর্ণিমা দেখত তা-না। তারা তাস খেলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ত। আকাশে চাঁদ উঠেছে কি না তারচেয়ে তিনবেলা কী আয়োজন হয়েছে—এই সংবাদ সংগ্রহে তাদের উৎসাহী বলে মনে হতো।

আকাশের তারা দেখার জন্যে আমার কাছে খুব দামি দু'টা টেলিস্কোপ আছে। এর একটি পৃথিবীর ঘূর্ণনের সঙ্গে তাল রেখে নিজেও ঘুরে যেন Focus নষ্ট না হয়। এখন পর্যন্ত আমার কোনো বন্ধুকে বলতে শুনি নি যে, 'আজ আকাশের তারা দেখা যাক!'

অ্যাসিমভের *বুক অব ফ্যাক্ট* দেখে আমার মনে পড়ল কলেজজীবনের কথা। তখন মোটা একটা চামড়ায় বাঁধানো খাতা কিনেছিলাম। খাতা ভর্তি করে ছিলাম নানান ধরনের তথ্য দিয়ে। খাতাটা এখন সঙ্গে থাকলে কাজে আসত। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় বাবার লাইব্রেরির সমস্ত বইপত্রের সঙ্গে খাতাটাও হারিয়ে গেছে। খাতার টুকে রাখা একটি তথ্য দেখি নোয়েল বোথাম সাহেবের বইতেও আছে। তথ্যটা হলো—

Twinkle Twinkle Litle Star
How I Wonder What You are...

এই নার্সারি রাইমটি সঙ্গীতের মাস্টার মোৎসার্ট পাঁচ বছর বয়সে রচনা করেছিলেন

সব বাদ দিয়ে এই তথ্যটি মনে রাখার একটা কারণও আছে। কারণটা হলো লাল কলির একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে আমি লিখেছিলাম, তথ্যটি বিশ্বাসযোগ্য না। মোৎসার্ট ছিলেন জার্মান। পাঁচ বছর বয়সে তাঁর ইংরেজি জানার কথা না।

নোয়েল বোথাম সাহেবের বইটিই বা অগ্রাহ্য করি কীভাবে? বইটি *Time* পত্রিকার Best seller list-এ অনেকদিন ছিল।

বোথাম সাহেব 'ঢাকা'র একটি তথ্যও বইতে দিয়েছেন। তিনি অবশ্যি ঢাকাকে India-র একটি শহর ধরে নিয়েছেন। বইয়ে লেখা Decca, India.

তথ্যটা হলো—

ঢাকা শহরের ভিক্ষুকরা কনভেনশন করে সিদ্ধান্ত নেয় পনেরো পয়সার নিচে তারা ভিক্ষা নেবে না।

বোথাম সাহেবের বইয়ের সর্বশেষ তথ্যটি আমার পছন্দ হয়েছে। তিনি বলছেন, যত Statistics প্রকাশিত হয় তার ৯৭ ভাগই বানানো।

কথা হচ্ছে তাঁর নিজের বইটিও Statistics-এ ভর্তি। তাহলে কি...

উৎসর্গপত্র

লেখকদের প্রকাশিত বইপত্রে উৎসর্গ পাতা বলে একটা পাতা থাকে। সেখানে লেখকরা তাদের প্রিয়জনদের নামে বইটা উৎসর্গ করেন। একমাত্র ব্যতিক্রম ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি উৎসর্গ করার মতো কোনো বন্ধু তাঁর লেখক-জীবনে পান নি।

আমি দুইশ'র মতো বই লিখে ফেলেছি। প্রতিটি বইয়ের উৎসর্গ পাতা আছে। এমনও হয়েছে একটা মানুষকে দু'বার-তিনবার বই উৎসর্গ করেছি।

মানুষ ছাড়া পশুপাখিকেও বই উৎসর্গ করার ঘটনা ঘটিয়েছি। শহীদুল্লাহ হলে যখন থাকি, তখন একটা বিড়ালের সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়। বিড়ালটা শহীদুল্লাহ হলের একজন হাউস টিউটর সাহেবের কন্যার। তার নাম এখন মনে করতে পারছি না। বিড়ালটার উচিত ছিল সে বাড়িতেই থাকা। কিন্তু কোনো এক বিচিত্র কারণে আমি যখন লেখার টেবিলে লেখালেখি করি, সে এসে লাফ দিয়ে টেবিলে ওঠে এবং একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমাদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হয়। যেমন—

আমি : খবর কী রে ?

বিড়াল : মিঁয়াও (ভালো)।

আমি : খাওয়াদাওয়া হয়েছে ?

বিড়াল : মিয়াও মিঁয়াও (একটু আগে খেয়েছি)।

আমি : আমি চা খাচ্ছি, তুই খাবি ? দেবো পিরিচে ঢেলে ?

বিড়াল : মি-য়া-ও (ধন্যবাদ দাও)।

এই বিড়ালটাকে আমি যে বই উৎসর্গ করি, সেই বইটির নাম 'নিষাদ'।

বিড়াল ছাড়াও দু'তিনটা বই ভূত-প্রেতকে উৎসর্গ করেছি। ওরা সেইসব পড়েছে কি না জানি না।

তাহলে ঘটনা এই দাঁড়াল যে, বই উৎসর্গ করার ব্যাপারে আমার কোনো বাছবিচার নেই। ঘটনা কিন্তু সত্যি না। বাছবিচার অবশ্যই আছে। আমি ক্ষমতার

ধারেকাছে বাস করেন এমন কাউকে বই উৎসর্গ করি না। সারা জীবনই ক্ষমতার কাছ থেকে দূরে থাকতে চেয়েছি।

ঢাকা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট কি ক্ষমতাধর কেউ ?

অবশ্যই। বাংলাদেশের ক্ষমতাবানদের আসর হলো ঢাকা ক্লাব। এই আসরে আমার মতো অভাজনের থাকার কথা না। সাত থেকে আট বছর আগে ঢাকা ক্লাব থেকে আমাকে জানানো হলো, তারা আমাকে সম্মানিত সদস্য করেছেন।

ঢাকা ক্লাবের যে প্রেসিডেন্ট এই কাজটি করেছেন, তাঁর সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয় নি। আমি ক্লাব টাইপ মানুষ না। ক্লাবে যাই না বললেই চলে।

ক্লাবের বর্তমান প্রেসিডেন্টকে আমি চিনি। আমার বই উৎসর্গ নীতিমালায় তাঁকে বই উৎসর্গ করা যায় না। তিনি ক্ষমতাবানদের একজন। তারপরেও কেন বই উৎসর্গ করা হলো ? কারণ তাঁর পক্ষীপ্রেম। আমি তাঁকে তাঁর নাম ধরে ডাকি না। আমি ডাকি পক্ষীবন্ধু নামে। তাঁকে উৎসর্গ করা বইটার নাম, 'উঠোন পেরিয়ে দু'পা'। উৎসর্গ পাতায় লেখা—

'পক্ষীবন্ধু' সাদাত সেলিম,
আপনি পাখিদের ভালোবাসেন।
পাখিরা কি আপনাকে ভালোবাসে ?

তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, পাখিরাও তাঁকে ভালোবাসে। আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করেছি।

ঢাকা ক্লাবে যতবারই যাই, তিনি কিছু সময় আমার সঙ্গে কাটান। দু'জনের মধ্যে কথা হয় পাখি বিষয়ে। এই বিষয়ে তাঁর জ্ঞান দেখে মুগ্ধ হই। একদিন তাঁকে বললাম, আচ্ছা ভাই মানুষ যেমন পাগল হয়ে যায়, পক্ষী সমাজে কি এমন ঘটনা ঘটে ? একটা পাখি হঠাৎ পাগল হয়ে গেল ? আমাদের নুহাশ পল্লীতে এরকম একটা পাগল-পাখি আছে।

তিনি বললেন, কী পাখি ?

একটা কোকিল।

সে কী পাগলামি করে ?

আমি বললাম, তার বসন্তকালে ডাকার কথা। সে সারা বছরই ডাকে।

সেলিম সাহেব বললেন, এরকম হওয়ার তো কথা না। কোকিল হিমালয়ের পাখি। গরমের সময় সে হিমালয়ে চলে যাবে।

তিনি কোকিল সম্পর্কে বিস্তারিত বলা শুরু করলেন। দু'জন মুগ্ধ শ্রোতা— একজন আমি, অন্যজন আমার স্ত্রী শাওন।

সাইকোলজিস্টরা মানুষের মানসিকতা বুঝার জন্যে একটা পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষা হলো, তারা দ্রুত কিছু শব্দ উচ্চারণ করেন। যার ওপর পরীক্ষা করা হচ্ছে, তাকে শব্দ শুনে প্রথম কী মাথায় আসছে তা বলতে হয়। উদাহরণ—

সাইকোলজিস্ট : রাত্রি।

সাবজেক্ট : অন্ধকার।

সাইকোলজিস্ট : গোলাপ।

সাবজেক্ট : সুগন্ধ।

সাইকোলজিস্ট : যুবতী।

সাবজেক্ট : রূপবতী।

এরকম একটা পরীক্ষায় আমাকে যদি সাইকোলজিস্ট বলেন, ঢাকা ক্লাব। এর উত্তরে বলব, পক্ষীবন্ধু সাদাত সেলিম। ঢাকা ক্লাব উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় পক্ষীবন্ধুর ইমেজ আসে।

অন্যদিন ঢাকা ক্লাব-কে নিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা করছে। আমি তাদের পোষা লেখক। আমাকে তো লিখতেই হবে। পক্ষীবন্ধুর ওপরে লিখতে পেরে ভালো লাগছে। তাঁর প্রিয় ঢাকা ক্লাব এবং অতিপ্রিয় পক্ষীরা ভালো থাকুক। এই শুভ কামনা।

জন্মদিনের উপহার

তাঁর বয়স ৭৫, তিনি অন্য দেশে বাস করেন। হঠাৎ হঠাৎ তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। এই মানুষটির জন্মদিন আমার বাসায় পালন করা হবে। মানুষটি উপস্থিত থাকবেন না। জন্মদিনের উৎসবের ব্যাপারটাও তিনি জানেন না।

জন্মদিন মানেই কেক এবং মোমবাতি। কেক আসবে হোটেল শেরাটন থেকে। তার দায়িত্ব নিয়েছে *অন্যদিন* পত্রিকার সম্পাদক মাজহার। জন্মদিনের গানটি গাইবে গায়িকা মেহের আফরোজ শাওন। কারণ যার জন্মদিন পালিত হবে তিনি শাওনের গান আগ্রহ করে শোনেন।

'Happy birth day to you' নামের বিখ্যাত গানটি এই উপলক্ষে বাংলায় করা হয়েছে। সুর ঠিক রেখে বাংলায় গানটি গীত হবে। গানটি এরকম—

আহা কী শুভ জনম তিথি!
আহা কী শুভ এ দিন!
বন্ধু তোমাকে ভালোবাসি মোরা
আজ ভালোবাসিবার দিন॥

জন্মদিন আয়োজন করছে Old Fools' Club. বৃদ্ধ বোকা সংঘ। অনেকেই হয়তো জানেন না, কিছু অতি কাছের বন্ধু নিয়ে আমার একটা ক্লাব আছে। এই ক্লাবের সদস্যরা প্রায়ই উদ্ভট কর্মকাণ্ড করেন। উদাহরণ—

ক্লাবের সব সদস্য সাধুসন্ন্যাসীর গেরুয়া পোশাক পরে এক রাতে ট্রেনে করে সিলেট রওনা হয়ে গেল। তারা যেখানেই যায় তাদের ঘিরে উৎসাহী এবং কৌতূহলী জনতা। সবাই জানতে চায়, ব্যাপারটা কী? অমরা করো প্রশ্নেরই জবাব দেই না। সাধুসন্ন্যাসীদের মতো স্মিত হাসি।

আরেকটি উদাহরণ, ভাদ্র মাসে চারদিকে পানি থাকে বলে জোছনা হয় তীব্র। সেই জোছনা দেখা এবং চাঁদের আলোয় স্নান করার উৎসব হবে শালবনে। বৃদ্ধ বোকা সংঘের সব সদস্য উপস্থিত। অমরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছি। চন্দ্রদর্শন উৎসব শুরু হলো 'আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে' গান দিয়ে। শাওন দরদ

দিয়ে চোখ বন্ধ করে গান করছে, হঠাৎ চোখ খুলেই বলল, 'ও মাগো'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতি বিখ্যাত গানে 'ও মাগো' ব্যবহার করেন নি। আমরা চমকে তাকালাম এবং দেখলাম প্রকাণ্ড এক সাপ। চারদিকে হুটোহুটি ছোটাছুটি। চন্দ্রদর্শন উৎসব সর্পদর্শনে সমাপ্তি। বৃদ্ধ বোকা সংঘের এক সদস্য ক্ষুব্ধকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, হুমায়ূনের পাগলামির সঙ্গে আমি আর নাই। সাপটা আমার পায়ের ওপর দিয়ে গিয়েছে। আমি Old Fools' Club থেকে পদত্যাগ করলাম।

আমার মনে হয় কার জন্মদিনে পালিত হচ্ছে তা বলার সময় এসে গেছে। তাঁর নাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

মাসখানেক আগেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। সেন হোজের (সানফ্রানসিসকো) হোটেল হিলটনের সামনে একটা বেঞ্চ পাতা। তিনি সেখানে একাকী বসে সিগারেট টানছেন। তিনি গেছেন বঙ্গ সম্মেলনে যোগ দিতে। আমিও গিয়েছি। এই সূত্রে দেখা। আমি তাঁর পাশে বসলাম।

অনেক দিন পর দেখা হলে কিছু সামাজিক কথাবার্তার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। যেমন, কেমন আছেন ? কবে এসেছেন ? শরীর কেমন ? বৌদি কেমন ? ইত্যাদি।

সুনীল সেইদিকে গেলেন না। রোজই আমাদের দেখা হচ্ছে এই ভঙ্গিতে বললেন, কাল রাতে কী করেছি শোন। হোটেলের জানালা খুলে মুখ বের করে সিগারেট খেয়ে ফেলেছি। এরা আবার হোটেলের রুমে নোটিশ টানিয়েছে। রুমে সিগারেটের গন্ধ পাওয়া গেলে দুশ' ডলার জরিমানা। তোমার বৌদি চিন্তায় আছে।

আমার প্রিয় এবং পছন্দের মানুষটিকে নিয়ে কিছু গল্প করি। গল্পগুলিই হচ্ছে তার জন্যে আমার দিক থেকে জন্মদিনের উপহার।

গল্প : এক

আমার বড় মেয়ে নোভার বিয়ে। তখন আমি পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা বাস করি 'দখিন হাওয়া'র একটা ফ্ল্যাটে। খুব ইচ্ছা মেয়ের বিয়েতে পুরোপুরি যুক্ত হওয়া। তা পারছি না। আমি ঠিক করলাম, এমন একটা উপহার তাকে দেব যে উপহার কোনো মেয়েকে তার বাবা দেন নি। যেন আমার মেয়ে তার সন্তানদের এই উপহারের কথা আগ্রহ করে বলে : আমার বড় মেয়ের অতি পছন্দের লেখকের নাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। বিয়ের আসরে তাঁকে কি উপস্থিত করা যায় ? আমি তাঁকে দেখিয়ে নোভাকে বলতে পারি, 'বাবা! তোমার বিয়েতে এই আমার

উপহার। বাংলা সাহিত্যের একজন গ্র্যান্ডমাস্টারের বিয়ের আসরে উপস্থিতি। তাঁর আশীর্বাদ।'

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে ঘটনাটা জানানো হলো। তিনি সব কাজ ফেলে স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় এসে বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন।

আমার হতভম্ব মেয়ে চোখে রাজ্যের বিস্ময় এবং আনন্দ নিয়ে লেখকের পা স্পর্শ করল। এই পবিত্র দৃশ্য আমৃত্যু আমার মনে থাকবে।

গল্প : দুই

কলকাতায় একটি সাহিত্য অনুষ্ঠান। আয়োজক সেখানকার বাংলাদেশ মিশন। অনুষ্ঠানের সভাপতি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যে আমি আছি এবং একজন ঔপন্যাসিক আছেন—হার্ডকোর ঔপন্যাসিক। নাম বলতে চাচ্ছি না। ঐ ঔপন্যাসিক আমার অগ্রজ। আমাকে যথেষ্টই পছন্দ করেন। সেদিন তাঁর কিছু একটা সমস্যা সম্ভবত হয়েছিল। মঞ্চে উঠে সরাসরি আমাকে ইঙ্গিত করে কঠিন সব কথা বলে যেতে লাগলেন। তাঁর মূল কথা, আমি বস্তাপচা প্রেমের উপন্যাস লিখে সাহিত্যের বিরাট ক্ষতি করছি। বাণিজ্য-সাহিত্য করছি। প্রেম ছাড়া যার লেখায় কিছুই নেই।

বিদেশ বিভূঁইয়ে এমন আক্রমণের জন্যে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। উত্তরে কিছুই বলতে ইচ্ছা করছিল না। চোখে পানি এসে যাবার মতো হলো। সবশেষে সভাপতি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উঠলেন। আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর বললেন, হুমায়ূন আহমেদকে এককভাবে যে আক্রমণ করা হয়েছে আমাকেও তার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। একজন লেখক প্রেম নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলেন কেন বুঝলাম না। পৃথিবীর সব সঙ্গীত, চিত্রকলা এবং সাহিত্যের মূল বিষয় 'প্রেম'। যিনি এই বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করেন তিনি কি আসলেই লেখক ?

অনুষ্ঠান শেষ হলো। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, আজ গল্পপাঠের একটি আসর আছে। আমি একটি গল্প পড়ব, সমরেশ মজুমদার একটি গল্প পড়বেন। আপনি আসুন, আমার সঙ্গে আপনিও একটি গল্প পড়বেন। সব লেখকই জানেন তিনি কোন মাপের লেখক। আপনি আপনার বিষয়ে জানেন। এবং আমি নিজেও কিন্তু জানি। যার যা ইচ্ছা বলুক, আমরা গল্প তৈরি করে যাব।

গল্প : তিন

অন্যদিন পত্রিকার সম্পাদক মাজহারের বাড়িতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় গিয়েছেন। ফটোসেশন হচ্ছে। সুনীলভক্তরা একের পর এক ছবি তুলছে। মাজহারের কাজের ছেলেটির নাম আজাদ। সে আমার কানে কানে বলল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সে একটা ছবি তুলতে চায়। তবে সাধারণ ছবি না। তাঁর ঘাড়ে হাত রেখে। আমি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে বলতেই তিনি বললেন, অবশ্যই ঘাড়ে হাত রেখে ছবি তুলবে। আজাদ হাসিমুখে এগিয়ে এল।

সুনীল বললেন, তুমি কি আমার কোনো বই পড়েছ ?

আজাদ বলল, জি-না স্যার।

সুনীল বললেন, আমার ঘাড়ে হাত রেখে ছবি তোলার অধিকার তো তাহলে তোমার অনেক বেশি। এসো আমরা দু'জন দু'জনের ঘাড়ে হাত রাখি।

ছবি তোলা হলো।

আমার জন্যে খুবই বিরক্তির একটি বিষয় হচ্ছে সাংবাদিকদের কাছে ইন্টারভ্যু। পত্রিকা সম্পাদকরা তাদের স্টাফদের ভেতর থেকে মেধাশূন্য কাউকে খুঁজে বের করে আমার কাছে পাঠান। তারা চোখমুখ শক্ত করে ইন্টারভ্যু শুরু করে। তেমন এক ইন্টারভ্যুর কথা বলতে ইচ্ছা করছে। কারণ সেখানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় চলে এসেছেন।

সাংবাদিক : সুনীলদার *পূর্বপশ্চিম* পড়েছেন ?

আমি : পড়েছি।

সাংবাদিক : আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে সুনীলদা এত বড় কাজ করে ফেলেছেন। আপনি পারলেন না কেন ?

আমি : উনি স্বাধীনতা যুদ্ধ দেখেন নি বলে লেখাটা তাঁর জন্যে সহজ হয়েছে।

সাংবাদিক : না দেখলে লেখা সোজা ?

আমি : অবশ্যই। মীর মশাররফ হোসেন কারবালার যুদ্ধ দেখেন নি বলে *বিষাদসিন্ধু* লিখে ফেলতে পেরেছেন।

সাংবাদিক : আপনার কিন্তু উচিত *পূর্বপশ্চিমের* মতো একটা উপন্যাস লেখা।

আমি : ভাবছি লিখব। নামও ঠিক করে ফেলেছি।

সাংবাদিক : কী নাম ?

আমি : নামটা একটু বড়। 'পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, ঊর্ধ্ব-অধঃ।' এই উপন্যাসে সবদিক ধরা হবে। ঠিক আছে ?

ইন্টারভ্যুর এই গল্পটি বলার আমার একটা উদ্দেশ্য আছে। পৃথিবীর খুব কম লেখকই সবদিক তাদের লেখায় তুলতে পেরেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নিজের অজান্তেই তা পেরেছেন। এই ধরনের লেখকদের শুধু জন্মদিন থাকে। তাঁদের মৃত্যু হয় না বলে তাঁদের মৃত্যুদিন বলে কিছু থাকে না।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়! শুভ জন্মদিন।

লেখক বন্‌ধ

আমরা যাকে বলি হরতাল, কোলকাতায় তাকে বলে 'বন্‌ধ'। 'কোলকাতা বন্‌ধ' মানে সে শহর অচল। কাজকর্ম বন্ধ।

লেখকরা মাঝে মাঝে অচল হয়ে পড়েন। ইংরেজিতে তাকে বলে Writer's block. আমি এর বাংলা করেছি— লেখক বন্‌ধ।

রাইটার্স ব্লক নিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। Adger Alanpoe না কি রাইটার্স ব্লক হলে পকেটে পিস্তল নিয়ে বের হয়ে পড়তেন। কাউকে খুন করলে ব্লক কাটবে এই আশায়। তাঁর নামে খুনের অভিযোগ অবশ্যি আছে। কে জানে রাইটার্স ব্লক কাটানোর জন্যে এই খুন করা হয়েছে কি না।

বিভূতিভূষণ রাইটার্স ব্লক হলে বনেজঙ্গলে হাঁটতেন। এতে বাংলা সাহিত্যের লাভই হয়েছে। বনভূমি নিয়ে অপূর্ব লেখা আমরা পেয়েছি।

> "বাতাবি লেবুর ফুল নয়, ঘেঁটুফুল নয়, আম্রমুকুল নয়, কামিনী ফুল নয়, কী একটা নামগোত্রহীন রূপহীন নগণ্য জংলি কাঁটাগাছের ফুল। আমার কাছে কিন্তু তাহাই কাননভরা, বনভরা, কুসুমরাজির প্রতীক হইয়া দেখা দিল।..." (আরণ্যক)

ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম তাঁর কখনো রাইটার্স ব্লক হয়েছে কি না। তিনি সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলেছেন, রাইটার্স ব্লক হবার সময় কোথায় ? সময় পেলে না হবে। লিখে কূল পাচ্ছি না।

এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামত জানতে পারলে ভালো হতো। আমি কোনো লেখায় কিছু পড়ি নি। কোলকাতার *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর একটি চিঠিতে পড়েছিলাম বেশ কিছুদিন হলো তিনি লিখতে পারছেন না। সেই না পারাটা শারীরিক কোনো অসুস্থতার কারণে কি না তা এখন আর মনে পড়ছে না।

কল্লোল যুগের লেখকদের কেউ কেউ নাকি ব্লক ছুটানোর জন্যে 'বিশেষ পল্লী'তে যেতেন। সেই পল্লীতে তারা ব্লক ছাড়াও যেতেন বলেই ব্লক কাটানোর উপায় 'বিশেষ পল্লী' হতে পারে না।

রাইটার্স ব্লক ব্যাপারটা সম্পর্কে একটু ব্যাখ্যা করে বলি। এটা এক ধরনের অসুখ। সাধারণ পর্যায়ে অসুখের লক্ষণ হচ্ছে—লিখতে ইচ্ছা না হওয়া। মাথায় গল্প আছে, কিন্তু লিখতে ইচ্ছা করছে না। সাধারণ এই অসুখ সর্দিজ্বরের মতো কোনোরকম চিকিৎসা ছাড়াই আরাম হয়। এই অসুখ সাতদিনের মধ্যেই সারে।

এখন বলি জটিল ধরনের রাইটার্স ব্লকের কথা। এই রোগে রোগী (অর্থাৎ লেখক) মারাও যান। নোবেল পুরস্কার পাওয়া জাপানি ঔপন্যাসিক কাওয়াবাতা হারিকিরি করে মারা গিয়েছিলেন। আত্মহত্যার কারণ হিসেবে অনেকেই লিখতে না পারার কষ্টের কথা বলেছেন। যে কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বিষয়ে একই কথা। যদিও তাঁর পরিবার থেকে বলা হয়েছে বন্দুকের নল পরিষ্কার করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু। অনেকেই বলেন, হঠাৎ লেখা বন্ধ হবার কষ্টে আত্মহনন।

রোগের কঠিন আক্রমণে লেখক দিশেহারা হয়ে যান। কী করবেন বুঝতে পারেন না। ঘন্টার পর ঘন্টা লেখার টেবিলে বসে থাকেন। একটি শব্দও তাঁর কলম দিয়ে বের হয় না। তাঁর নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হয়। সেই রাগ তিনি পরিবারের সদস্যদের প্রতি ছড়িয়ে দেন। এক পর্যায়ে শারীরিকভাবেও তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বেঁচে থাকা তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হতে থাকে।

বহুকাল আগে আমি আমেরিকার Iowa বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিয়েটিভ রাইটিং বিভাগে গিয়েছিলাম আমন্ত্রিত লেখক হিসেবে। সেখানে পৃথিবীর নানান দেশের লেখক এসেছিলেন। গল্প, কবিতা পাঠ, সেমিনার এই ছিল প্রোগ্রাম। মোটামুটি হাস্যকর অবস্থা। এক কবিতা পাঠের আসরে দুই কবির মধ্যে মারামারি পর্যন্ত লেগে গেল। কবিরা যে বক্সিং-এ ওস্তাদ হন তা জানতাম না।

একটি সেমিনার ছিল রাইটার্স ব্লকের ওপর। লেখকরা বলেছেন নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কথা। রাইটার্স ব্লক হলে তারা কী করে এর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করেন এইসব।

একজন বললেন, (তিনি কোন দেশের লেখক, কী নাম তা এখন আর মনে করতে পারছি না) আমি তখন আপেল খাই। সবুজ আপেল। এতে আমার রাইটার্স ব্লক কাটে। [আমি নিশ্চিত এটা একটা ফাজলামি। তার কোনোদিনই রাইটার্স ব্লক হয় নি। এই অসুখ গৌণ লেখকের হয় না।]

আরেকজন বললেন, আমি চলে যাই সমুদ্রের কাছে। সমুদ্রের ঢেউ কীভাবে আছড়ে পড়ে তা দেখি। ধারাবাহিক ঢেউ দেখতে দেখতে লেখার ধারাবাহিকতা ফিরে আসে। [আমি সেমিনারের শেষে আলাপ করে জেনেছি এই লেখক থাকেনই সমুদ্রের পাড়ের এক বাংলোবাড়িতে।]

ইন্দোনেশিয়ার এক কবি বললেন, আমি তখন যোগব্যায়াম করি। এবং চোখ বন্ধ করে ফিবোনাচ্চি সিরিজ ভাবি। এতে আমার ব্লক কাটে। [ব্যায়ামের অংশটা ঠিক হতে পারে, তবে ফিবোনাচ্চি সিরিজের ব্যাপারটা পুরোটাই ভুয়া বলে আমার ধারণা। কারণ এই সিরিজ কিছুক্ষণের মধ্যেই যথেষ্ট জটিল হয়ে দাঁড়ায়। খাতাকলম ছাড়া সিরিজের সংখ্যা বের করা অসম্ভব ব্যাপার। যদি না তিনি রামানুজন বা ইউলারের মতো বড় কোনো ম্যাথমেটিশিয়ান না হন। ফিবোনাচ্চি সিরিয়েল হলো ১ ১ ২ ৩ ৫ ৮ ১৩ ২১...]

লেখকরা নিজেদের প্রসঙ্গে বানিয়ে বানিয়ে অনেক কিছু বলতে পছন্দ করেন। তারা সারাক্ষণ এক ধরনের ঘোরের মধ্যে থাকেন বলেই অন্যরা যে বানিয়ে বলা বিষয়টা ধরে ফেলেছে তা বুঝতে পারেন না।

এখন আমি আমার নিজের রাইটার্স ব্লক বিষয়ে বলি। না, এই জিনিস আমার হয় না। কাগজ-কলম নিয়ে লেখার টেবিলে বসলেই হলো। মনে করা যাক, হিমু নিয়ে একটা লেখা লিখছি। হঠাৎ লেখা আটকে গেল। তখন অন্য একটা খাতা টেনে নেই। লিখি মিসির আলি বা সায়েন্স ফিকশান। এ থেকে কী প্রমাণিত হয়? দু'টি জিনিস প্রমাণিত হয়।

ক) আমি একজন গৌণ লেখক। কারণ শুধুমাত্র গৌণ লেখকরাই রাইটার্স ব্লক থেকে মুক্ত।

খ) আমি একজন শ্রমিক লেখক। শুধুমাত্র শ্রমিক লেখকরাই সারাক্ষণ লিখতে পারেন।

তবে আশার কথা এইসব নিয়ে আমি মোটেই চিন্তিত না। 'আমার এই লিখে যাওয়াতেই আনন্দ।'

পাদটিকা

শাওন আমার এই লেখার প্রুফ দেখছিল। সে বলল, রাইটার্স ব্লক বিষয়ে নিজের সম্পর্কে যা লিখেছ তা ঠিক না। আমার পরিষ্কার মনে আছে 'লীলাবতী' উপন্যাস লেখার সময় হঠাৎ লেখা বন্ধ হয়ে গেল। রাতে ঘুমাতে পার না। সারারাত টিভি দেখ, হাঁটাহাঁটি কর। খাওয়া প্রায় বন্ধ হবার জোগার। তোমার ব্লক বিশদিনের মতো ছিল।

শাওনের কথায় যথেষ্ট অহ্লাদ বোধ করলাম। রাইটার্স ব্লক যেহেতু হচ্ছে মনে হয় আমি গৌণ লেখক না। হা হা হা। বেঁচে থাকুক রাইটার্স ব্লক।

উন্মাদ-কথা

সন্তানদের নাম সাধারণত বাবা-মা কিংবা অন্য গুরুজনরা রাখেন। আমার সর্বকনিষ্ঠ ভাই আহসান হাবীবের নাম আমার রাখা। বাবা তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের জন্যে নাম খুঁজছিলেন। আমার এক বন্ধুর নাম আহসান হাবীব। দুর্দান্ত ভালো ছেলে (এখন আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকনমিক্সের অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট তবলাবাদক। বাঙালিদের গানের অনুষ্ঠান তার তবলা বাদন না হলে জমে না।) আমি বাবাকে বললাম, আহসান হাবীব নামটা কি রাখবেন? আমার বন্ধু এবং খুব ভালো ছেলে।

বাবা তাঁর নিউমরোলজির বইপত্র খুললেন। হিসাবনিকাশ করে বললেন, নিউমরোলজিতে ভালো আসছে। আহসান হাবীব নামের জাতকের জীবন শুভ হবে। এই নামই রাখা হলো। খাসি জবেহ করে আকিকা করা হলো না। বাবার সেই সামর্থ্য ছিল না। অনেক বছর পর যখন আমার সামান্য টাকাপয়সা হলো তখন আমি যেসব ভাইবোনের আকিকা করা হয় নি তাদের নামে আকিকার ব্যবস্থা করলাম। এই ঘটনায় আমার মা পরম সন্তোষ লাভ করলেন।

ছোট ভাইয়ের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। সে ছিল অতি রূপবান এক বালক। গায়ের রঙ দুধে আলতা টাইপ। শৈশবে তার 'হজকিনস ডিজিজ' হয়েছিল। তাকে কঠিন চিকিৎসার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছিল বলেই হয়তো রঙের এমন পরিবর্তন।

প্রিয় পাঠক, শৈশবে আমার গায়ের রঙও না-কি দুধে আলতা টাইপ ছিল। (আমার মায়ের ভাষ্য।) একবার কঠিন রক্ত আমাশা হলো। আমার গায়ের রঙ হয়ে গেল শ্রীলংকানদের মতো। ছোটবেলায় আমার গায়ের রঙ কী ছিল আমার মনে নেই, তবে আমার মা যে কালো ছিলেন সেটা মনে আছে। মা'র কাছে শুনেছি, বাবা একটা কালো মেয়ে বিয়ে করে এনেছেন এই নিয়ে দাদার বাড়িতে অনেক 'মন্তব্য' করা হয়েছে। মা'কে আড়ালে চোখের পানি ফেলতে হয়েছে। সেই কালো মহিলাকে এখন দেখলে চমকাতে হয়। ধবধবে সাদা রঙ। এই মহিলা নিজের দুই পুত্রকে কালো বানিয়ে নিজে কীভাবে গৌরবর্ণ ধারণ করলেন কে জানে? জগৎ রহস্যময়।

রঙ প্রসঙ্গ আপাতত থাকুক। আহসান হাবীব প্রসঙ্গে আসি। সে ছিল বাবার অতি প্রিয়পুত্র। দু'টি কারণে প্রিয়।

১. মজার মজার গল্প বলত। তার গল্প শুনে বাবা হো হো করে হাসতেন। বেচারাকে একই গল্প প্রতিদিন তিন-চারবার করে শোনাতে হতো।

২. তার গলায় সুর ছিল। যে-কোনো গান একবার শুনলেই নির্ভুল সুরে গাইতে পারত।

আহসান হাবীব প্রথম গুণটি নিয়ে এখন জীবন চালিয়ে যাচ্ছে। *উন্মাদ* পত্রিকা, রম্য লেখা, জোকসের বই। প্রতি বইমেলাতে তার জোকস-এর বই বের করা রেয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে।

তার দ্বিতীয় গুণটি বিকশিত হয় নি। সে কাউকে গান গেয়ে শুনিয়েছে এমন শোনা যায় নি। গান গাওয়ার প্রতিভা বিকশিত হলে এখন হয়তো তার কয়েকটি গানের ক্যাসেট থাকতো। *উন্মাদের* বিশেষ সংখ্যার সঙ্গে একটা শ্যাম্পুর মিনি প্যাক, কফির মিনি প্যাক এবং আহসান হাবীবের গানের CD ফ্রি দেওয়া হতো।

সে মোটামুটি রেজাল্ট করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জিওগ্রাফিতে M.Sc করল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামীণ ব্যাংকে ভালো চাকরি পেল। চাকরি ঢাকার বাইরে। সাতদিনের মাথায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঢাকায় উপস্থিত। মা'কে বলল, সকালবেলায় নাশতার সমস্যা এই জন্যে চাকরিতে রিজাইন দিয়ে চলে এসেছি।

মা'র কাছে মনে হলো চাকরি ছাড়ার কারণ ঠিকই আছে। যেখানে খাওয়াদাওয়ার সমস্যা, সেই চাকরি করার দরকার কী ? তিনি ছেলেকে কাছে পেয়ে বরং খুশি হলেন।

নাশতা সমস্যায় এমন একটা ভালো চাকরি ছাড়ার যুক্তি আমার কাছে কখনোই গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। আমার ধারণা ঢাকায় সে বন্ধুবান্ধব ফেলে গেছে। তাদের টানেই চাকরি ছেড়ে চলে এসেছে। তার কাছে বন্ধুবান্ধব অতি গুরুত্বপূর্ণ। আমি যে তাকে ডেকে কিছু উপদেশ দেব তাও সম্ভব না। কারণ উপদেশ দেবার বিষয়টা আমাদের পরিবারে নাই। আমরা উপদেশ দেই না, কারো উপদেশ শুনিও না।

অবশ্য তাকে উপদেশ দেওয়ার যোগ্যতাও আমার ছিল না। সে বড় হয়েছে একা একা। আমি তখন সংসার নামক ঠেলাগাড়ি ঠেলতে ব্যস্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারারের সামান্য কিছু টাকা সম্বল। বিরাট সংসার। আমরা ছয় ভাইবোন, মা। আমার ছোটমামাও আমাদের সঙ্গে থেকে পড়াশোনা করেন। কোনোদিকে তাকানোর অবস্থা নেই। আহসান হাবীব স্কুলে ভর্তি হবে। কে তাকে নিয়ে যাবে ?

বেচারা নিজেই খুঁজে খুঁজে একটা স্কুল বের করল। মা'র কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভর্তি হয়ে গেল। স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব বললেন, বাবা তোমার গার্জিয়ান কোথায় ? সে হাসিমুখে বলল, স্যার আমিই আমার গার্জিয়ান। কখন সে পাস করল, কখন কলেজে গেল, কলেজ শেষ করে ইউনিভার্সিটিতে—কিছুই তো জানি না। তাকে কী করে আমি বলি, তোমার ভালো চাকরি মন দিয়ে করা দরকার।

সে তার *উন্মাদ* পত্রিকা নিয়ে আছে। ভালো আছে বলেই আমার ধারণা। আর ভালো না থাকলেই বা কী!

আহসান হাবীবকে নিয়ে কাঠপেন্সিল লেখার একটা আলাদা কারণ আছে। কারণটা শুনলে পাঠক বিস্মিত হবেন বলেই এই লেখা।

আহসান হাবীব শব্দের রঙ দেখতে পায়। সে বলে যখনই কোনো শব্দ হয় তখনই সে সেই শব্দের রঙ দেখে। কখনো নীল, কখনো লাল, সবুজ, কমলা। মাঝে মাঝে এমন সব রঙ দেখে যার অস্তিত্ব বাস্তব পৃথিবীতে নেই।

তরুণ গবেষক হিসেবে আমি তাকে নিয়ে কিছু গবেষণাও করি। হারমোনিয়ামের একেক রিড একেক ফ্রিকোয়েন্সিতে বাজে। আমি তাকে আলাদা আলাদা করে প্রতিটি ফ্রিকোয়েন্সি বাজিয়ে শোনালাম। সে রঙ বলল। আমি লিখে রাখলাম। পনেরো দিন পর আবারো সেই পরীক্ষা। রঙগুলো যদি বানিয়ে বানিয়ে বলে তাহলে দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় এলোমেলো ফল আসবে। আরেকটু পরিষ্কার করে বলি। গানের সাতটা স্বর হলো—সা রে গা মা পা ধা নি। প্রথমবারের পরীক্ষায় সে বলেছে—

সা : নীল

রে : সবুজ

গা : গাঢ় সবুজ

মা : কমলা

ইত্যাদি—

পনেরোদিন পর একই পরীক্ষা যদি করা হয়, তাহলে একই উত্তর তাকে দিতে হবে। ভিন্ন উত্তর দিলে বুঝতে হবে রঙের ব্যাপারটা সে বানিয়ে বানিয়ে বলছে।

ঘটনা সেরকম ঘটল না। সে একই উত্তর দিল। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। এ ধরনের রঙ দেখার কারো ক্ষমতা আছে তা আমার চিন্তাতেও ছিল না।

তার মতো ক্ষমতা যে আরো কিছু মানুষের আছে তা জানলাম রাশিয়ান একটা পত্রিকা পড়ে। পত্রিকার নাম *Sputnik*। *রিডার্স ডাইজেস্ট*-এর মতো

পত্রিকা। সেখানে বিশাল এক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে যার বিষয় 'কিছু কিছু মানুষের শব্দের রঙ দেখার অস্বাভাবিক ক্ষমতা'।

উন্মাদ অফিসে বসে আহসান হাবীব এখনো রঙ দেখে কি না জানি না। আমরা ভাইবোনরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। কেউ কারো খবর রাখি না। বাবা-মা-ভাইবোনদের নিয়ে একসময় ভালোবাসার বৃত্তের মধ্যে একটা সংসার ছিল। সেই বৃত্ত ভেঙে গেছে। নতুন বৃত্ত তৈরি করে প্রত্যেকেই আলাদা সংসার করছি। আমাদের সবার ভুবনই আলাদা। এই ভুবনও একদিন ভাঙবে। আমরা অচেনা এক বৃত্তের দিকে যাত্রা শুরু করব। সেই বৃত্ত কেমন কে জানে! পৃথিবীতেই এত রহস্য। না জানি কত রহস্য অপেক্ষা করছে অদেখা ভুবনে।

অসুখ

ছোটখাটো অসুখ আমার কখনো হয় না। সর্দিকাশি-জ্বর কখনো না। পচা, বাসি খাবার খেয়েও আমার পেট নামে না। ব্যাকপেইনে কাতর হয়ে বিছানায় পড়ে থাকি না। আধকপালি, সম্পূর্ণ কপালি কোনো কপালি মাথাব্যথা নেই। মুড়িমুড়কির মতো প্যারাসিটামল আমাকে খেতে হয় না।

এক বিকেলে দু'টা Ace নামের প্যারাসিটামল খেয়ে ফেললাম। শাওন বিস্মিত হয়ে বলল, মাথাব্যথা?

আমি বললাম, না। এক সাহিত্য অনুষ্ঠানে যাব। সেখানে মাথা ধরতে পারে ভেবেই অ্যাডভান্স ওষুধ খাওয়া।

ছোট রোগ-ব্যাধি যাদের হয় না, তাদের জন্যে অপেক্ষা করে বড় অসুখ। একদিন কথা নেই বার্তা নেই গলা দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। এক চামচ দু'চামচ না, কাপভর্তি রক্ত। আমি হতভম্ব। কিছুক্ষণের মধ্যে নাক দিয়েও রক্তপাত শুরু হলো। আমার শরীরে এত রক্ত আছে ভেবে কিছুটা আহ্লাদও হলো।

তখন আমি চিটাগাং-এর এক হোটেলে। শিশুপুত্র নিষাদকে নিয়ে শাওন আছে আমার সঙ্গে। নিষাদ অবাক হয়ে তার মা'কে জিজ্ঞেস করল, মা। এত রক্ত দিয়ে আমরা কী করব?

আমি তার কথায় হো হো করে হাসছি। শাওন বলল, এই অবস্থায় তোমার হাসি আসছে?

আমি সঙ্গে সঙ্গে হাসি বন্ধ করলাম। আসলেই তো এই অবস্থায় হাসা ঠিক না। আমার উচিত কাগজ-কলম নিয়ে এপিটাফ লিখে ফেলা। কল্পনায় দেখছি নুহাশপল্লীর সবুজের মধ্যে ধবধবে শ্বেতপাথরের কবর। তার গায়ে লেখা—

"চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে
নিয়ো না, নিয়ো না সরায়ে।"

এখন বলি হার্ট অ্যাটাকের গল্প। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে আমার চিকিৎসা চলছে। প্রথম ধাক্কা সামলে ফেলেছি। আজরাইল খাটের নিচেই ছিল। ডাক্তারদের

প্রাণপণ চেষ্টায় বেচারাকে মন খারাপ করে চলে যেতে হয়েছে। আমাকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কেবিনে। কতদিন থাকতে হবে ডাক্তাররা পরিষ্কার করে বলছেন না।

এক সকালবেলায় হাসপাতালের লোকজনের মধ্যে অতিরিক্ত ব্যস্ততা দেখা গেল। আমার বিছানার চাদর বদলে দেওয়া হলো। জানালায় পর্দা লাগানো হলো। ঝাড়ুদার এসে বিপুল উৎসাহে ফিনাইল দিয়ে মেঝে ঘষতে লাগল। তারপর দেখি তিনজন অস্ত্রধারী পুলিশ। একজন ঢুকে গেল বাথরুমে, দু'জন চলে গেল বারান্দায়। আমি ডিউটি ডাক্তারকে বললাম, ভাই আমাকে কি অ্যারেস্ট করা হয়েছে? অপরাধ কী করেছি তাও তো জানি না।

ডিউটি ডাক্তার বললেন, বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট শাহাবুদ্দিন সাহেব আপনাকে দেখতে আসছেন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন?

সেটা তো আমরাও জানি না। প্রেসিডেন্টের প্রেস সচিব খবর দিয়েছেন তিনি আপনাকে দেখতে আসবেন।

আমি মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেলাম এই দফায় আমি মারা যাচ্ছি। শুধুমাত্র মৃত্যুপথযাত্রী কবি-সাহিত্যিকদেরকেই দেশের প্রধানরা দেখতে আসেন।

প্রেসিডেন্ট শাহাবুদ্দীন আমার প্রিয় মানুষদের একজন। তাঁর সততা, দেশের প্রতি ভালোবাসা তুলনাহীন। তিনি আমাকে দেখতে আসছেন জেনে নিজেকে খানিকটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে।

ছোটখাটো মানুষটা দুপুরের দিকে এলেন। বিছানার পাশে রাখা চেয়ারে বসলেন। যে কথাটা বললেন তাতে সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে পানি এসে গেল। তিনি ময়মনসিংহের ভাষায় বললেন, এখন মারা গেলে চলবে? আপনার নোবেল পুরস্কার আনতে হবে না!

আমি বললাম, আপনি কি জানেন এই মুহূর্তে আপনি আমাকে যে পুরস্কার দিয়েছেন তা নোবেল পুরস্কারের চেয়েও বড়?

থাকুক এসব কথা, বাইপাস অপারেশনের গল্পে চলে যাই। সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথের ডাক্তার আমার বাইপাস করবেন। অপারেশন হবে ভোরবেলায়। সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মূল কারণ আমাকে সাহস দেওয়া।

আমি বললাম, ঠিক করে বলুন তো ডাক্তার অপারেশনে আমার মৃত্যুর আশঙ্কা আছে না? আপনি কি ১০০ ভাগ গ্যারান্টি দিতে পারবেন যে বেঁচে থাকব?

না।

মৃত্যুর আশঙ্কা কত ভাগ?

ফাইভ পার্সেন্ট।

তাহলে আজ রাত বারোটা পর্যন্ত আমাকে ছুটি দিন। রাত বারোটা পর্যন্ত আমি আনন্দ করব। এক গ্লাস ওয়াইন খাব। সিগারেট খাব। মনের আনন্দ নিয়ে সিঙ্গাপুরের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখব। রাত বারোটা বাজার আগেই ফিরে আসব।

ডাক্তার বললেন, কাল ভোরবেলায় আপনার অপারেশন। মেডিকেশন শুরু হয়ে গেছে। এখন এসব কী বলছেন?

আমি বললাম, অপারেশনের পর আমি তো মারাও যেতে পারি।

আপনি কী করেন জানতে পারি?

আমি একজন লেখক। গল্প বানাই।

একজন লেখকের পক্ষেই এমন উদ্ভট প্রস্তাব দেওয়া সম্ভব। আচ্ছা দেখি আমি কিছু করতে পারি কি না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে রাজি করানো কঠিন হবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, বিশেষ ব্যবস্থায় আমাকে রাত বারোটা পর্যন্ত ছুটি দেওয়া হলো। মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালের আমিই না-কি প্রথম বাইপাস পেশেন্ট—যাকে এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

অপারেশন টেবিলে আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দু'জন নার্স চাকা লাগানো বিছানা ঠেলতে ঠেলতে নিচ্ছে। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। একজন হাস্যমুখি আবার হি হি করে কিছুক্ষণ পরপর হাসছে। তার গা থেকে বোটকা গন্ধও আসছে। চায়নিজ মেয়েদের গা থেকে গা গুলানো গন্ধ আসে। চায়নিজ ছেলেরা হয়তো এই গন্ধের জন্যেই পাগল।

আমি চোখ বন্ধ করলাম। কোনো সুন্দর দৃশ্যের কল্পনা করা যায় কি না তার চেষ্টা। জোছনাস্নাত অপূর্ব কোনো রজনীর স্মৃতি। কিংবা শ্রাবণের ক্লান্তিবিহীন বৃষ্টির দিনের স্মৃতি। কিছুই মাথায় আসছে না। চোখ মেললাম এনেসথেসিস্টের কথায়। এনেসথেসিস্ট বললেন (তিনি একজন মহিলা), তুমি ভয় পাচ্ছ?

আমি বললাম, না।

আশ্চর্যের কথা, আসলেই ভয় পাচ্ছিলাম না। কেন ভয় পাচ্ছি না তাও বুঝতে পারছি না। পরে শুনেছি ভয় কমানোর একটা ইনজেকশন না-কি তারা দেয়।

অজ্ঞান করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শরীর হালকা হতে শুরু করেছে। অস্পষ্টভাবে কোনো একটা বাদ্যযন্ত্রের বাজনা কানে আসছে। হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে কেউ বাদ্যযন্ত্র বাজাবে না। তাহলে কে বাজাচ্ছে?

স্লাইড রুল

আজকালকার ছেলেমেয়েরা স্লাইড রুলের নাম শোনে নি। স্লাইড রুল হলো গুণ-ভাগ করার স্কেল। একটা স্কেলের ভেতর ছোট্ট একটা স্কেল। ছোট স্কেলটা slide করতে পারে বলে স্লাইড রুল নাম। রুল এসেছে রুলার থেকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কাজ ছিল ফার্স্ট ইয়ারের কেমিস্ট্রি ছাত্রছাত্রীদের স্লাইড রুলের ব্যবহার শেখানো। বড় বড় অংক কত সহজে রুলার নাড়াচাড়া করেই সমাধান করা যায় তা দেখে সবাই মুগ্ধ হতো। চোখ বড় বড় করে বলত—'বাহ্!' তাদের এই বিস্ময় ধ্বনি শোনার জন্যেই আমি আগ্রহ করে স্লাইড রুল বিষয়ক ক্লাসগুলি নিতাম।

এখন অনেক জটিল অংক নিমিষেই ক্যালকুলেটারের বোতাম টিপে করা যায়। যারা অংকগুলি করে তারা কেউ বিস্ময়সূচক 'বাহ্' ধ্বনি করে না। ক্যালকুলেটর জটিল অংক করবে এটা নিপাতনে সিদ্ধ। এই নিয়ে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের হাত থেকে স্লাইড রুল কেড়ে নিয়েছে। বিস্মিত হবার বিষয়গুলি দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে।

চলে গেছে টেলিগ্রাম। মোর্স সাহেবের টরে টক্কা। ট্রেনে যাবার সময় রেল লাইন ধরে টেলিগ্রাফের খুঁটি। তারের ওপর পাখিদের বসে থাকার দৃশ্য দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। আজ আর কোনো যুবা পুরুষের কাছে টেলিগ্রাম আসে না—

Mother serious. Come sharp.

এই টেলিগ্রামের অর্থ যে মা অসুস্থ তা কিন্তু না। এর গূঢ় অর্থ, তোমার বিয়ে ঠিক হয়েছে। চলে এসো। মায়ের অসুখের খবর জানিয়ে ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া।

টেলিগ্রামের আলাদা ভাষাই ছিল। মাত্র সাতটা শব্দের মধ্যে যা বলার বলতে হতো। শব্দ বেশি ব্যবহার করার অর্থ বেশি চার্জ। অল্প শব্দে টেলিগ্রাম করার জন্যে বিচিত্র ভাষা তৈরি হয়ে গেল।

উদাহরণ দেই। ছেলেকে জানানো হবে—বাবা এখন অনেক সুস্থ। সবাইকে চিনতে পারছেন। তোমাকে দেখতে চাচ্ছেন। আঙুর খেতে চাচ্ছেন। কিছু আঙুর নিয়ে চলে এসো। দেরি করবে না।

BABA BETTER RECOGNIZING SEE YOU COME GRAPE.

অন্যরা এই টেলিগ্রামের মর্মার্থ বুঝবে না। যার কাছে পাঠানো হয়েছে সে ঠিকই বুঝবে।

হারিয়ে যাচ্ছে চিঠি। আজকাল কেউ আর চিঠি লিখে না। SMS চালাচালি করে। SMS-এর কী বিচিত্র ভাষা—KFC CHICKEN KHABE ? Love U

অর্থ—KFC'র চিকেন খাবে ? তোমাকে ভালোবাসি।

ফাউনটেন পেন চলে গেল।

এখন বলপয়েন্ট। কালি শেষ কলম ফেলে দাও। আমাদের সময় চালু ঝর্ণা কলমের নাম ছিল 'রাইটার' আর 'পাইলট'। সবার বুকপকেটে কলম শোভা পেত। জামাইদের উপহার ছিল শেফার্স কলম। তারো আগে নিবের কলম। আমার শৈশবের কলম হলো নিবের কলম। আমাদের সময়ে ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত দোয়াত থাকত। একটা দোয়াত ছিল, উল্টে গেলেও কালি পড়ত না। দোয়াতের কালি আমরা নিজেরা বানাতাম। এক আনা দামের কালির ট্যাবলেট পাওয়া যেত। এক দোয়াত কালি বানাতে একটা টেবলেটই যথেষ্ট ছিল। যে সব ছেলেমেয়ের বাবার টাকাপয়সা আছে, তারা দু'টা ট্যাবলেট দিত। তাদের কালির রঙ ছিল দর্শনীয়।

হাতঘড়ি উঠে যাব উঠে যাব করছে। তাদেরও মৃত্যুঘণ্টা বাজছে। সময় দেখার জন্যে এখন আর হাতঘড়ির প্রয়োজন নেই। হাতে মোবাইল আছে। সেখানে সময় দেখা যায়। শুধু সময় না, কী বার, কত তারিখ কোন শতাব্দী সব।

একসময় হাত ঘড়ির কী বাবুয়ানিই না ছিল! রেডিওর সঙ্গে সেই ঘড়ির টাইম মিলানো হতো। হাতঘড়ির টাইম রেডিও টাইম কি না তা জানা আবশ্যক ছিল। জামাইদের উপহার সামগ্রীর মধ্যে অবশ্যই হাতঘড়ি থাকতে হতো।

মৃত্যুঘণ্টা বাজছে এমন কিছু জিনিসপত্রের তালিকা আমি তৈরি করেছি। পাঠকরা মিলিয়ে দেখতে পারেন।

১. শিলপাটা

গুঁড়া মসলা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। আদা বাটা, রসুন বাটাও পাওয়া যাচ্ছে। মসলা গুঁড়া করার মেশিন সস্তায় কিনতেও পাওয়া যাচ্ছে, শিলপাটার কী দরকার ? এই বস্তু যেহেতু চলে

যাচ্ছে—চলে যাবে শিলপাটা ধার করাবার কর্মীর। ক্লান্ত দুপুরে ঘুঘু পাখির ডাকের মতো তাদের গলা শোনা যাবে না। জানালার কাছে এসে কেউ বলবে না, 'শিলপাটা ধার করাইবেন'?

২. বই

বাসস্থান ছোট হয়ে আসছে। বই রাখার জায়গা নেই। বইয়ের প্রয়োজনও তেমন নেই। ইন্টারনেট চলে এসেছে। যে-কোনো প্রয়োজনীয় বই ইন্টারনেটে পড়া যাবে। একটা সময় ছিল যখন মধ্যবিত্তের স্বপ্নে সবসময় ছোট্ট একটা লাইব্রেরি থাকত। সেই লাইব্রেরির দর্শনীয় সংগ্রহ—এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা। অতি যত্নে ঝাড়পোছ করে রাখা এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা ছিল রুচি এবং বিদ্যানুরাগের শ্রেষ্ঠ নির্দশন। (যাদের সংগ্রহে এই জিনিস আছে, তাদের কেউ তার পাতা উল্টে কখনো দেখেছেন এমন অপবাদ দেওয়া ঠিক হবে না।)

বিত্তবানদের বাড়িতে জায়গার অভাব নেই। তবে তাঁদের বইয়ের লাইব্রেরির জায়গা দখল করে নিয়েছে হোম থিয়েটার নামক এক বস্তু।

হারিয়ে যাওয়া জিনিসের তালিকা বড় করতে ইচ্ছা করছে না। যা হারিয়ে যাবার তা হারিয়ে যাবে। এদের জন্যে শোকগাথার কোনো প্রয়োজন নেই। 'আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম!' বলে বিলাপ সঙ্গীত অর্থহীন।

পৃথিবী বদলাবে এটাই তো স্বাভাবিক। হারিয়ে যাওয়া সমস্ত নিয়ে আমরা হা হুতাশ করব এটাও স্বাভাবিক।

তাহলে স্লাইড রুল নিয়ে লেখাটা কেন লিখলাম? সেদিন পুরনো ট্রাংক ঘাঁটতে গিয়ে আমার স্লাইড রুলটা খুঁজে পেলাম। একচল্লিশ বছর আগে আশি টাকা দিয়ে এটা কিনে ভেবেছিলাম বিজ্ঞানের কী অপূর্ব একটা আবিষ্কার এখন আমার হাতে। আমি কত না ভাগ্যবান!

আমার আছে জল
(সাধারণ জল না, হট ওয়াটার)

কিছুদিন আগে একটা ছবি বানিয়ে শেষ করেছি। নিজেরই যৌবনকালের রচনা 'আমার আছে জল' উপন্যাসের চিত্ররূপ। প্রযোজক চ্যানেল আই। ছবিতে শর্ত জুড়ে দেওয়া, লাক্স সুন্দরী প্রতিযোগিতায় যে মেয়েটি প্রথম হয়েছে সে-ই হবে নায়িকা। অভিনয় জানুক বা না-জানুক। কঠিন শর্ত। শর্ত মানার অর্থ হচ্ছে ঢেঁকির চেয়েও বেশি কিছু গেলা, রাইস মিল গেলা। আমি রাইস মিল গিলে ফেললাম। কারণ অর্থনৈতিক না, কারণ হৃদয়নৈতিক। লেখালেখি করতে গিয়ে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তখন অন্যকিছু করতে ইচ্ছে করে। ছবি বানানোর সময় আমার মধ্যে প্রবল ঘোর কাজ করে। এমনিতেই আমি ঘোরলাগা মানুষ। বাড়তি ঘোরে কঠিন নেশার অনুভূতি হয়। বড় ভালো লাগে।

ছবি বানাতে প্রথম যে জিনিসটি লাগে তার নাম অর্থ। অর্থের পরেই লাগে একটা নিখুঁত চিত্রনাট্য। চিত্রনাট্য নিয়ে মোটেই মাথা ঘামালাম না। ভাবটা এরকম, আমারই তো 'ছাগল'। ইচ্ছেমতো কেটেকুটে নিব। ছবির শুটিং শুরু হবে ফেব্রুয়ারির ২০ তারিখ থেকে। চিত্রনাট্য বাদ দিয়ে আমি করছি লেখালেখি। *মধ্যাহ্ন* উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড। আমার চিন্তা-চেতনায় *মধ্যাহ্ন*, 'আমার আছে জল' না।

লেখালেখি শেষে চিত্রনাট্য নিয়ে বসলাম এবং প্রথম যে বাক্যটি উচ্চারণ করলাম তা হচ্ছে, 'খাইছে আমারে।' পড়লাম গভীর জলে। নানানভাবে চেষ্টা করেও চিত্রনাট্য দাঁড় করাতে পারছি না। এদিকে 'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি'। গান লেখা হয়ে গেছে। গানে সুর দেওয়া হয়েছে। পাত্রপাত্রীরা তৈরি। ক্যামেরা, ক্রেন, ট্রলি, বৃষ্টি, জেনারেটর রেডি। রেডি না চিত্রনাট্য। আমি সারাদিন লিখি, সন্ধ্যাবেলায় যা লিখি ছিঁড়ে কুচিকুচি করি। পুত নিষাদ ছেঁড়া কাগজে হামাগুড়ি দিয়ে বড়ই আনন্দ পায়। আমি ভাবি, নিষাদের বয়সে ফিরে যেতে পারলে কত সুখেই না থাকতাম।

করুণাময় একসময় করুণা করলেন। একদিন অবাক হয়ে দেখি, চমৎকার একটি চিত্রনাট্য দাঁড় করে ফেলেছি। শাওনকে পড়তে দিলাম। সে পড়ে গম্ভীর

হয়ে গেল। আমি বললাম, কোনো সমস্যা ? সে বলল, হ্যাঁ, সমস্যা।

কী সমস্যা ?

সে বলল, যে-কোনো অগা মগা বগা ডিরেক্টরকে এই চিত্রনাট্য দিলে সে সুন্দর ছবি বানিয়ে দিবে। ভালো ডিরেক্টর লাগবে না।

তার প্রশংসাবাক্য বড় ভালো লাগল। স্ত্রীর প্রশংসা পাওয়া যে কত জটিল বিষয় তা স্বামী মাত্রই জানেন।

মহাবিপদ সংকেত (দশ নম্বর)

চিত্রনাট্য তৈরি হবার পর মহাবিপদ সংকেতের ঘণ্টা বাজতে শুরু করল। ঘণ্টা আগেই বাজছিল। আমি নির্বোধ প্রকৃতির বলে বুঝতে পারি নি। একে একে শিল্পীরা ঝরে পড়তে শুরু করলেন।

প্রথমে সরে দাঁড়াল মাহফুজ। তাকে শুরুতে জামিল নামের একটি চরিত্রে নিয়েছিলাম। আলাভোলা টাইপ চরিত্র। পরে মনে হলো মাহফুজের চেয়ে জাহিদকে এই চরিত্রে ভালো মানাবে। মাহফুজকে মানাবে সাব্বির চরিত্রে। আমেরিকা প্রবাসী এক ফটোগ্রাফার। স্মার্ট, সুদর্শন। মাহফুজ বলল, না। সে জামিল ছাড়া অন্য চরিত্রে কাজ করবে না। তাকে অনেক বোঝালাম। সে বুঝল না।

মাহফুজ তার নানান কর্মকাণ্ডে অনেকবার আমাকে অনেক আনন্দ দিয়েছে, ঐদিনের কঠিন 'না' সব আনন্দ ছাপিয়ে প্রবল বেদনায় আমাকে ঢেকে দিল। বারবার মনে হলো, আমি সবসময় আমার স্নেহ অপাত্রে দান করেছি। যেখানে আমার নিজের পুত্রকন্যাই আমার স্নেহ বুঝতে পারে নি, সেখানে দূরের মাহফুজ কী করে বুঝবে ?

মাহফুজের পরেই ছিটকে সরে গেল রিয়াজ। তার করার কথা সাব্বির। রিয়াজকে যে মাহফুজের চেয়ে আমি কোনো অংশে কম স্নেহ করেছি তা না। ছেলেটির চেহারা যেমন সুন্দর আচার-ব্যবহারও সুন্দর। অতি মিশুক অতি আড্ডাবাজ মানুষ। ছবির জগতের মানুষদের কিছু অদ্ভুত হিসাব-নিকাশ থাকে। আমার ধারণা রিয়াজ অদ্ভুত হিসাবটা করল। সে ভাবল যেহেতু মাহফুজ সাব্বির চরিত্রটা করছে না কাজেই সেখানে নিশ্চয়ই 'কিন্তু' আছে। রিয়াজ টেলিফোনে জানাল, যে-সময়ে 'আমার আছে জল'-এর শুটিং হবার কথা সে-সময়ে তার অন্য একটা ছবির জন্যে সময় দেওয়া। তার মনে ছিল না... ইত্যাদি।

বাকি থাকল চ্যালেঞ্জার। সেইবা বাকি থাকে কেন ? একদিন জানলাম

টাকাপয়সা বিষয়ক কিছু সমস্যা তার হচ্ছে। ইদানীং নাটক এবং টেলিফিল্ম করে যে টাকা সে পায় চ্যানেল আই তাকে তারচেয়ে অনেক কম টাকা দিচ্ছে। সে দশদিন কাজ করে এর থেকে বেশি টাকা পায়। সেখানে একমাস! চ্যালেঞ্জারকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি। টাকাপয়সা তার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ এরকম আমার কখনোই মনে হয় নি।

অবশ্যই টাকাপয়সা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তারপরেও জীবন মাপার ব্যারোমিটার কখনোই অর্থ হতে পারে না। চ্যালেঞ্জারকে আমি নিজেই ছবি থেকে বাদ দিলাম। শাওন প্রবল আপত্তি করল। তার একটাই যুক্তি, চিত্রনাট্যে তুমি আইজি সাহেবের চরিত্র চ্যালেঞ্জারকে মাথায় রেখে তৈরি করেছ। চ্যালেঞ্জারকে বাদ দিয়ে অন্য যাকেই তুমি নিবে তার মধ্যে চ্যালেঞ্জারকে দেখতে চাইবে। যখন দেখবে না, তখন নিজেরই খারাপ লাগবে। তুমি চ্যালেঞ্জারকে বাদ দিও না।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, তোমার যুক্তি মানলাম, কিন্তু তালগাছটি আমার। আমি চ্যালেঞ্জারকে বাদ দিলাম।

কে করবে আইজি চরিত্র ?

কাউকে না পাওয়া গেলে আমি নিজেই করব।

পাগল হতে তোমার তো বেশি বাকি নেই।

আমি বললাম, নিশ্চিন্ত থাকো। ছবি শেষ হবার আগেই পুরোপুরি পাগল হয়ে যাব।

আমার সমুদ্রশয্যা দেখে শাওন খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল। একে টেলিফোন তাকে টেলিফোন—শিল্পী যোগাড় করা যায় কি না।

একরাতে হতাশ হয়ে চ্যানেল আই-এর হাসানকে টেলিফোন করে বললাম, চিত্রনাট্যটা তৈরি আছে। তুমি তৌকীর আহমেদকে চিত্রনাট্যটা দিয়ে ছবি করতে বলো। সে আগেও আমার চিত্রনাট্যে 'দারুচিনি দ্বীপ' বানিয়েছে। ভালো বানিয়েছে। এবারেরটা আরো ভালো হবে। তৌকীর পরিচালনা করলে আইজি সমস্যার সমাধান হবে। আবুল হায়াত সাহেব আনন্দের সঙ্গেই আইজি করবেন।

হাসান বিড়বিড় করে বলল, বিশ তারিখ থেকে শুটিং শুরু, আজ সতের তারিখ, এখন আপনি এইসব কী বলছেন ?

সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলেন আসাদুজ্জামান নূর। শাওনকে তিনি 'মা' ডাকেন। শাওন যখন করুণ গলায় বলল, নূর চাচা, হুমায়ূন আহমেদ মহাবিপদে পড়েছে। তার শরীর কত খারাপ সেটা তো আপনি জানেন। তাকে দেখলে মনে হয় যে-কোনো সময় হার্ট অ্যাটাক হবে। আইজি চরিত্রটি আপনি করে দিন, কিংবা আলী যাকের চাচাকে রাজি করান।

নূর বললেন, মা, তুমি হুমায়ূনকে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করো। আমি বিশ তারিখের আগেই আলী যাকেরকে রাজি করাব। সে রাজি না হলে আমি তো আছিই। তুমি হুমায়ূনকে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে বলো।

শাওন বলল, নূর চাচা থ্যাংক ইউ।

বলতে বলতে সে চোখ মুছল। গভীর আবেগে এবং আনন্দে তার চোখে পানি এসে গেছে। সে আমাকে ধরা গলায় বলল, এখন তোমার অশান্তি দূর হয়েছে তো? চলো কোনো ভালো রেস্টুরেন্টে গিয়ে দু'জনে ডিনার করি। তুমি তো খাওয়াদাওয়াই ছেড়ে দিয়েছ।

আমরা বিশাল সাইজের লবস্টার দিয়ে ডিনার সারলাম। রাতে খুব আরামের ঘুম হলো।

উনিশ তারিখ আসাদুজ্জামান নূর জানালেন, তিনি বা আলী যাকের দু'জনের কেউই অভিনয় করতে পারবেন না।

আমি শাওনের আহত এবং দুঃখিত মুখের দিকে তাকাতেই পারছিলাম না। সে করুণ গলায় বলল, চ্যালেঞ্জারকে বলি? আমাদের এত বড় বিপদে তিনি পাশে দাঁড়াবেন না এটা হতেই পারে না।

আমি বললাম, না।

ছবির কী হবে?

ছবি হবে। আগামীকাল থেকেই শুটিং। Countdown শুরু হয়েছে। মাঝখানে থামা যাবে না।

আইজি চরিত্র কে করবেন?

জানি না।

আইজি চরিত্রে অভিনয় করার জন্যে এগিয়ে এলেন পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়। যে করুণা এই মানুষটি আমার প্রতি দেখিয়েছিলেন সেই করুণা যেন বহুগুণে এই মানুষটির প্রতি বর্ষিত হয়, তাঁর প্রতি এই আমার শুভ কামনা। গুরু নানক বলেছেন—

দু'গুনা দত্তার
চৌগুনা জুজার

যে দু'গুণ দেয় সে চারগুণ ফেরত পায়। গুরু নানকের এই বাক্যটি আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।

ফটোগ্রাফার সাব্বির

ফটোগ্রাফার সাব্বির চরিত্রে অভিনয় করতে এগিয়ে এলেন চিত্রজগতের আরেক নায়ক ফেরদৌস। তার সঙ্গে আমি *চন্দ্রকথা* ছবিতে কাজ করেছি। চিত্রনায়কদের নায়কসুলভ সমস্যা থেকে সে বহুলাংশে মুক্ত। বিয়ের পর তার স্বভাবে এবং আচরণে অন্য ধরনের স্থিরতা এসেছে। 'আমার আছে জল' ছবিতে সাতদিনের নোটিশে তাকে যে রাজি করিয়েছে তার নাম হাসান। হাসান এই দায়িত্ব পালন করে মহানন্দে ইউরোপ বেড়াতে চলে গেল। আমি এবং শাওন খুবই আনন্দ পেলাম। আমরা সাব্বির নামের কঠিন একটি চরিত্রে একজন Dependable আর্টিস্ট পেলাম।

ফেরদৌসকে অনেক শিডিউল (এ দেশে এবং পশ্চিমবঙ্গের) উলটপালট করতে হলো। তার মধ্যে যতটুকু ফাঁক পাচ্ছিল সে সিলেট থেকে বিমানে চলে যাচ্ছিল, অন্য সিডিউলে কাজ করে আবার ফিরে আসছিল।

ফেরদৌসের একটা ছোট্ট গল্প বলার লোভ সামলাতে পারছি না। পাঠকরা জানেন কি না জানি না, ছবির সব নায়ক এবং নায়িকাদের আলাদা চেয়ার এবং বিশাল রঙিন ছাতা থাকে। নায়ক-নায়িকাদের সহকারীরা চেয়ার এবং ছাতা বহন করে।

আমি একদিন ভুল করে ফেরদৌসের চেয়ারে বসে পড়েছি। খুবই আরামদায়ক চেয়ার। ফেরদৌস ব্যাপারটা লক্ষ করল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার স্ত্রীকে টেলিফোন করল।

স্যার আমার চেয়ারটায় বসে খুব আরাম পেয়েছেন বলে আমার মনে হয়েছে। তুমি তো এখন লন্ডনে। তুমি অবশ্যই লন্ডনের যে দোকান থেকে আমার এই চেয়ারটা কিনেছ, অবিকল সেরকম একটা চেয়ার কিনে সিলেটে পাঠাবার ব্যবস্থা করবে।

আমি ফেরদৌসের টেলিফোনের বিষয়ে জানি না। একদিন বিস্মিত হয়ে দেখি, একই রকম দু'টা চেয়ার পাশাপাশি। ফেরদৌস বিনীত গলায় বলল, স্যার, এটা আপনার জন্যে। গহীন জঙ্গলে পাওয়া এই উপহার কিছুক্ষণের জন্যে আমাকে অভিভূত করে রাখল। মনে হলো সে আমার অভিনেতা না, আমারই ছেলে। বাবার বসার কষ্ট দেখে দূরদেশ থেকে একটা চেয়ার আনিয়েছে।

জাহিদ হাসান

টিভির নায়করা যে চলচ্চিত্রের নায়কদের মতোই বিপদজনক সঙ্গী এই ধারণা জাহিদকে দেখে জন্মেছে। যেখানেই জাহিদ সেখানেই শত শত ভক্ত। কেউ

জাহিদ ভাইয়ের কাঁধে হাত রেখে ছবি তুলবে। কেউ অটোগ্রাফ নেবে। রিকশাওয়ালা রিকশা নিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ জাহিদকে দেখে অতি পরিচিত ভঙ্গিতে বলবে, আরে জাহিদ ভাই। ভালো আছেন ? মৌ আপু ভালো ?

আমি জাহিদের মতো রসবোধসম্পন্ন মানুষ দ্বিতীয়টি দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তাৎক্ষণিক Humour-এ তার জুড়ি নেই। তার রসিকতায় মুগ্ধ হয়ে কতবার যে হো হো করে হেসেছি।

পাঠকরা কি জানেন, সে পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়ে এবং 'ছাইপাশ' খায় না ? 'ছাইপাশ' খাওয়া অভিনেতারা অভিনয়ের অঙ্গ মনে করেন, সেখানে একজন তা খায় না দেখে অবাক হয়েছি।

'আমার আছে জল' ছবিতে সে খুব ভালো অভিনয় করেছে। একটি অতি জটিল মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র চমৎকার ফুটিয়েছে। তার অভিনীত একটি দৃশ্য মনিটরে (আমাদের এই ক্যামেরায় মনিটর আছে) দেখে আমার চোখে পানি এসেছে। আমি মনে মনে বলেছি, 'জিতে রহ ব্যাটা।'

জাহিদের স্ত্রী মৌ এই ছবিতে কাজ না করেও সরবে উপস্থিত ছিল। হলদিরামের সনপাপড়ি আমি আগ্রহ করে খাই জানতে পেরে সে শুটিং-এর পুরো সময় সনপাপড়ির সাপ্লাইয়ের দিকে নজর রাখল। আমি মনের সাধ মিটিয়ে সনপাপড়ি খেলাম।

ছবি শেষ। সনপাপড়িও শেষ। জাহিদের সঙ্গে কথা ছিল ঢাকায় পৌঁছে সে সনপাপড়ির দোকানের ঠিকানা দেবে। ঢাকায় পৌঁছেই সে মোবাইল বন্ধ করে রেখেছে। মনে হচ্ছে সনপাপড়ির জন্যে আরেকটা ছবি পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

প্রথম রাতে বনবিড়াল বধ

সব স্বামীই বিয়ের রাতে বিড়াল মারতে চান। বিড়াল নিয়ে আসেন। বিছানার পাশে বেঁধে রাখেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেইসব বিড়াল স্ত্রীরা মেরে ফেলেন। বিড়ালবধি স্ত্রীদের হাতে স্বামীদের বাকি জীবন ভেড়া হয়ে থাকতে হয়।

ছবির শুটিং এক ধরনের বিবাহ প্রক্রিয়া। কাজেই এই বিবাহ প্রক্রিয়ায় বিড়ালবধ জরুরি। আমি ঠিক করে রেখেছিলাম, কোনো একটা কারণ বের করে শুটিং-এর প্রথম দিন খুব হৈচৈ করে এক পর্যায়ে বলব, 'কাজই করব না। প্যাক আপ।' সবাই বুঝবে, বাপরে, এত কঠিন পরিচালক!

আমাকে কারণ খুঁজতে হলো না। শুটিং-এর প্রথম দিন কারণ আপনাআপনি হাতে ধরা দিল।

টিলাগাঁও রেলস্টেশনে শুটিং। আইজি সাহেব দলবল নিয়ে ট্রেন থেকে নামবেন। ক্যামেরা ওপেন হবে সাড়ে নটায়। আমি নটায় উপস্থিত হলাম। ক্যামেরাম্যান মাহফুজুর রহমান তার আগেই এসেছেন। তিনি চিন্তিত ভঙ্গিতে চা খাচ্ছেন। তার চিন্তার কারণ শত শত মানুষ। এদের সরিয়ে শট কীভাবে নেয়া হবে ? চ্যানেল আই যে দুজনকে (প্রোডাকশন কন্ট্রোলার) সবকিছু দেখাশুনার দায়িত্ব নিয়ে পাঠিয়েছে তারা অনুপস্থিত। জানা গেল দুজনই ঘুমাচ্ছে। ঘুম ভাঙলে আসবে। ক্যামেরা চলে এসেছে, লাইটের লোকজন আসে নি। গাড়ি নেই। যে মাইক্রোবাস ক্যামেরা নিয়ে এসেছে সেটা নড়বে না। কারণ তাদের ওপর নাকি কঠিন নির্দেশ—ক্যামেরা ছাড়া এই মাইক্রোবাস আর কোনো কিছুই বহন করতে পারবে না।

ক্যামেরাম্যান মাহফুজুর রহমান বললেন, চা খান। রাগ কন্ট্রোলে রাখুন। আল্লাহপাক যা ঠিক করে রেখেছেন তারচেয়ে বেশি কিছু হবে না, কমও হবে না।

চায়ে চুমুক দিয়ে আমার রাগ আরো বেড়ে গেল। জাহিদের শ্বশুরবাড়ির চায়ের মতো চা। মুখে দেওয়া যায় না (জাহিদের শ্বশুরবাড়ির চা আমি কখনো খাই নি। জাহিদ আমাকে বলেছে বাংলাদেশের সবচেয়ে খারাপ চা হয় তার শ্বশুরবাড়িতে)।

আমার চা পানে বিঘ্ন ঘটল। মধ্যবয়স্ক টাকমাথার এক ভদ্রলোক উত্তেজিত ভঙ্গিতে এগিয়ে এলেন, সিলেটি ভাষায় বললেন, আপনারা সিলেটের ঐতিহ্য নষ্ট করছেন। জীবন থাকতে আমি সিলেটের ঐতিহ্য নষ্ট করতে দিব না।

ভদ্রলোককে সমর্থন দেবার জন্যে সমবেত জনতার এক অংশ বলল, অয় অয়। (অয় শব্দটির বাংলা মানে 'হ্যাঁ'।)

আমি বললাম, ঐতিহ্য কীভাবে নষ্ট করেছি ? সিলেটে কি ছবির শুটিং হয় না ?

হয়। কিন্তু ঐতিহ্য রক্ষা করার পর হয়।

সমবেত জনতা বলল, অয় অয়।

আমি বললাম, কী ঐতিহ্য নষ্ট করেছি ?

স্টেশনের নাম টিলাগাঁও। আপনারা সেই স্টেশনকে বানিয়েছেন 'সোহাগী'। স্টেশনের ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত হয়েছে।

সমবেত জনতা গর্জে উঠল, অয় অয়।

আমি তাকিয়ে দেখি, ঢাকা থেকে তৈরি করে আনা 'সোহাগী' নামফলক বিভিন্ন দিকে বসে গেছে।

ভদ্রলোক বললেন, শুটিং যদি করতেই হয় টিলাগাঁও নামে করতে হবে।

আমি বললাম, লেখক তার বইয়ে স্টেশনের নাম দিয়েছেন 'সোহাগী'। লেখকের অনুমতি ছাড়া অন্য নাম দেয়া যাবে না। 'সোহাগী' নামই ব্যবহার করতে হবে।

লেখকের কাছ থেকে অনুমতি আনেন। তাকে মোবাইল করেন।

আমিই লেখক। আমি অনুমতি দিলাম না।

আমার এই কথায় দর্শকদের এক অংশ হেসে ফেলল। ভদ্রলোক ছুটে বের হয়ে গেলেন।

আমি ভাবছি, না জানি নতুন কী যন্ত্রণা অপেক্ষা করছে। মাহফুজুর রহমান ফিসফিস করে বললেন, মব সাইকোলজি প্রেডিক্ট করা মুশকিল। কী হয় না হয় কে জানে। 'সোহাগী' নামফলক তুলে দিন। আমি বললাম, না।

ভদ্রলোক ফিরে এসেছেন। সঙ্গে আট ন' বছরের দুটি শিশু। তারা আমার দুপাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলবে। আমি বললাম, এখানে চারদিন শুটিং করব। ছবি তোলার অনেক সময় পাবেন। আপাতত পাবলিক কন্ট্রোল করুন। ছবির কাজ যেন ঠিকমতো করতে পারি সেই ব্যবস্থা করেন। ভদ্রলোক বললেন, অয় অয়। এবং অতি ব্যস্ততার সঙ্গে জনগণকে সামলাতে লাগলেন। স্টেশনের ঐতিহ্যবিষয়ক জটিলতার এইখানেই সমাপ্তি।

দুপুর একটার দিকে চ্যানেল আই-এর প্রোডাকশন কন্ট্রোলার এবং তার সহকারী এসে উপস্থিত হলো। প্রোডাকশন কন্ট্রোলারের নাম কামাল, অন্যজনের নাম ভুলে গেছি। অন্যজনের মাথায় টাক। তার চেহারা এবং আচার-আচরণ ধূর্ত প্রকৃতির।

আমি বললাম, তোমরা এত দেরিতে এসেছ?

স্যার, রাতে ঘুম হয় নাই। ঘুমাচ্ছিলাম।

ছবির মতো বড় ব্যাপারের সঙ্গে আগে যুক্ত ছিলে?

কামাল বলল, জি-না স্যার। এটাই আমার প্রথম চাকরি।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। চ্যানেল আই-এর হাসান বলেছিল, স্যার, নিখুঁত ব্যবস্থা থাকবে। সব এক্সপার্ট লোকজন দেওয়া হবে। ক্যামেরা ঠিক হবার পর আপনাকে ডাকা হবে। আপনি শুধু বলবেন, 'ক্যামেরা।' ক্যামেরা চালু হবে। আপনাকে সম্পূর্ণভাবে ঝামেলামুক্ত রাখার দায়িত্ব আমার।

আমি কামালকে বললাম, ছবির অতি জটিল এই কাজ করার কোনো অভিজ্ঞতা তোমাদের নেই। তোমাদেরকে দিয়ে আমার চলবে না। চ্যানেল আই-

এর একটি মাইক্রোবাস আমি দেখতে পাচ্ছি। এই মুহূর্তেই তোমরা এই মাইক্রোবাসে করে ঢাকায় চলে যাবে। বাকি কাজ আমি আমার লোকজন দিয়ে করাব।

দুজনই মনে হয় হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। একসঙ্গে বলল, জি আচ্ছা স্যার। ঢাকায় চলে যাচ্ছি।

বলেই লম্বা লম্বা পা ফেলে উধাও। আমি ভেবেই নিয়েছিলাম তারা চলে গেছে। কিন্তু সন্ধ্যার দিকে তাদেরকে আড়ালে আবডালে উঁকি দিতে দেখা গেল। তাদের ডেকে আবার যে ধমকাব সে ইচ্ছা করছে না। কারণ প্রথমদিনেই তিনটা সিকোয়েন্স করেছি। প্রতিটি সিকোয়েন্স চমৎকার হয়েছে। আমার মন প্রফুল্ল। কী আর হবে রাগারাগি করে!

প্রথম শট

ছবির প্রথম শট সব পরিচালকের কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছবির কিছু কুসংস্কারের একটি হলো, প্রথম শট এক টেকে Ok হতে হয়। Ok হবার পর বিপুল করতালি, তারপরই যাত্রা শুরু। আমি অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ বলেই প্রথম শটের পর যখন হাততালি হতে থাকে, তখন আমার চোখে পানি আসে। আমি ব্যস্ত থাকি চোখের পানি আড়াল করার চেষ্টায়।

আমার যেসব ছবিতে শাওন থাকে, তার প্রতিটির প্রথম শট তাকে নিয়ে করেছি। ব্যক্তিগত ভালোবাসা তার একটি কারণ। একই সঙ্গে প্রথম শট সে এক টেকে Ok করবেই এই বিশ্বাস। এই প্রথম 'আমার আছে জল' ছবিতে শাওনকে বাদ দিয়ে প্রথম শটের জন্যে বেছে নিলাম সাড়ে তিন বছর বয়সী শিশুশিল্পী ওয়াফাকে। প্রথম শটে শাওনকে বাদ দিয়েছি বলেই কেউ আবার ভেবে বসবেন না যে আমাদের ঝামেলা শুরু হয়েছে। অনেকদিন *মানবজমিন* পত্রিকায় আমার কোনো নিউজ যাচ্ছে না। এবার হয়তো যাবে, 'শাওনের সংসারে আগুন। অসহায় শিশু নিষাদের কাস্টডি কে পাবে?'

শাওনকে প্রথম শটে না নেয়ার কারণ তার সঙ্গের শিল্পীর মেকাপ শেষ হয় নি। অনেক সময় লাগবে। এতক্ষণ অপেক্ষা করার অর্থ হয় না। কাজেই শিশুশিল্পী ওয়াফা। শটটা এরকম—সোহাগী স্টেশনে সবাই নেমেছে। অপেক্ষা করছে কখন জিপ আসবে। তারা রওনা হবে ডাকবাংলোর দিকে। এই অবস্থায় সবার দৃষ্টি এড়িয়ে নিশাতের কন্যা টুনটুনি (ওয়াফা) নেমে পড়েছে রেললাইনে। হাতে দুধের বোতল। মাঝে মাঝে বোতলে টান দিচ্ছে। মনের আনন্দে রেললাইন ধরে হাঁটাহাঁটি করছে।

শিশুশিল্পীদের নিয়ে কাজ করতে আমি অনেক স্বচ্ছন্দ বোধ করি। এরা 'মিমিক' করায় ওস্তাদ। অনেকটাই রোবটের মতো। যা বলে দেয়া হবে তাই করবে। এক চুল এদিক-ওদিক হবে না। আমি বললাম, ওয়াফা, অ্যাকশন বলার সঙ্গে সঙ্গে তুমি বোতল হাতে রেললাইন ধরে হাঁটতে থাকবে। রেললাইনের তিনটা স্লিপার পার হবার পর থামবে। এইগুলিকে বলে স্লিপার। এক দুই তিন, এই জায়গায় থামবে। বোতলটা মুখে দিয়ে কিছুক্ষণ দুধ খাবে। তারপর উল্টোদিকে ফিরে হাঁটা ধরবে। আমি Stop না বলা পর্যন্ত হাঁটতেই থাকবে। পারবে ?

পারব।

ভুল হবে না ?

না।

একবার করে দেখাও।

সে করে দেখাল। নিখুঁতভাবে করল। তবে একবার ক্যামেরার দিকে তাকাল। ছবির ভাষায় বলা হয় False look. তাকে ভালোমতো বুঝিয়ে দেয়া হলো যেন ক্যামেরার দিকে না তাকায়।

ক্যামেরা চালু করে অ্যাকশান বললাম। ওয়াফা কোনোরকম ভুল ছাড়া শট Ok করল। তুমুল করতালি চলছে। আমি Stop বলতে ভুলে গেছি। ওয়াফা হেঁটেই যাচ্ছে। এত হৈচৈ হচ্ছে সে একবারও ফিরে তাকাচ্ছে না।

শিশুশিল্পীদের দিয়ে অভিনয় করানোর কিছু সমস্যাও আছে। একটা উল্লেখ করি। ওয়াফার একটা শট এরকম—গরুর গাড়ি করে তারা যাচ্ছে। সে আছে মায়ের সঙ্গে। হঠাৎ দেখল একদল অতিথি পাখি উড়ে যাচ্ছে। দেখেই সে বলল, মা, দেখো দেখো, Birds! আমি বুঝিয়ে দিলাম, অ্যাকশান বলা মাত্রই তুমি বলবে, 'মা, দেখো দেখো, Birds!'

আচ্ছা।

অ্যাকশান বললাম, সে নিখুঁতভাবে বলল। শট শেষ হয়ে গেল। এরপর শুরু হলো বিপদ। অন্য সিকোয়েন্স হচ্ছে। যতবারই বলছি অ্যাকশান; ওয়াফা বলছে, 'মা, দেখো দেখো, Birds!'

আমি ভালোমতো বুঝালাম। বললাম, এখন থেকে অ্যাকশান বললে, তুমি শুধু মা'র দিকে তাকিয়ে থাকবে মা কথা বলবে, তুমি শুনবে।

আচ্ছা।

আমি বললাম, অ্যাকশান! ওয়াফা যথারীতি বলল, মা, দেখো দেখো, Birds!

লাক্স সুন্দরী কথা

লাক্স সুন্দরীর নাম মীম। আমি ধরেই নিয়েছিলাম মেয়েটি মুসলমান। আলিফ লাম মীমের মীম থেকে তার নাম। মেয়ের মা বললেন, (গলা নামিয়ে) স্যার, আপনার মতো অনেকেই মনে করে আমরা মুসলমান। আসলে আমরা হিন্দু। মীমের আসল নাম বিদ্যা সিনহা সাহা। চ্যানেল আই এবং আমরা অনেক কায়দা করে তার আসল নাম গোপন রেখেছি। হিন্দু জানলে তো কেউ তারে ভোট দেবে না।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ স্যার।

তুমি কি সবাইকে এইসব কথা এখন বলে বেড়াচ্ছ ?

সবাইকে বলি না স্যার। যারা আপন তাদের বলি।

আমি মীমের মায়ের সরলতায় মুগ্ধ হলাম। মীম তার মা'র মতো সরল না, তবে জটিলও না। শিশুশিল্পীদের কাছ থেকে অভিনয় আদায়ের যে টেকনিক, আমি তার ক্ষেত্রেও সেই টেকনিক ব্যবহার করলাম। যা করতে বলা হবে অবিকল তাই করতে হবে। ডানে তাকাতে বললে ডানে তাকাবে। বামে তাকাতে বললে বামে। প্রতিটি step বলে দেওয়া।

কয়েকবার রিহার্সেল করা হলো। সে ঠিকমতো পারল। যখন ক্যামেরা চালু করা হলো তখন আর পারল না। আমি বললাম, আবার যদি ভুল কর আছাড় দিয়ে ট্রেন লাইনে ফেলে দেব। শুরু হলো কান্নাকাটি। আমি বললাম, চোখ মুছে শট দেবার জন্যে তৈরি হও।

মীমের কো-আর্টিস্ট জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় এই পর্যায়ে এগিয়ে এলেন। তিনি আমাকে বললেন, হুমায়ূন! মেয়েটা কান্নাকাটি করছে। তাকে আধঘণ্টা সময় দিন। সে নিজেকে Compose করুক।

আমি বললাম, না। আজ তাকে সময় দেওয়া হলে প্রতি শটেই সময় দিতে হবে। আজ যদি সে বের হয়ে আসে পরে আর সমস্যা হবে না।

আমি শট নিলাম। মীম উতরে গেল। তাকে নিয়েই আমার সব টেনশন। অভিনয়ের কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই ছবির এত বড় এবং এত জটিল চরিত্রে কাজ করা কঠিন বিষয়। দিনের শেষে আমি বলব, ছবি দেখে কেউ বলতে পারবে না এটা মেয়েটার প্রথম কাজ।

মেয়েটার বেশ কিছু প্লাসপয়েন্ট আছে—

১. সে ক্যামেরা ফ্রি।

২. সে ধমক ফ্রি। (ধমক খেয়ে কাজ করতে পারে)

৩. সে ভালো অনুকরণ করতে পারে।

তবে, তাকে প্রতিটি অংশ ধরিয়ে না দিলে সে কাজ করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। 'আমার আছে জল' ছবিতে অভিনয় করার অভিজ্ঞতাটা সে কাজে লাগাতে পারে কি না তাও দেখার বিষয় আছে। যদি কাজে লাগাতে পারে তাহলে তার ভবিষ্যৎ ভালো।

তাকে ক্ষতি করেছে শান্ত সুন্দরী গ্রুমিং সেশন নামক কর্মকাণ্ড। তার মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে—জীবনের সার কথা একটাই, নিজেকে সুন্দর দেখানো। সাজগোজেই সব।

মেকাপম্যান মেকাপ দিয়েছে সে চলে গেছে নিজের ঘরে। বাড়তি কিছু মেকাপ দেওয়া। আরো সুন্দর হবার চেষ্টা। তাকে অনেক বুঝানোর চেষ্টা করেছি। একদিন ডেকে বললাম, মীম! আমেরিকায় সবচে' বেশি সাজগোজ করে বুড়িরা। ঠোঁটে রঙ, গালে রঙ, চুলে রঙ। তারপরেই আসে মধ্যবয়স্করা। তোমার মতো বয়েসী মেয়েরা কোনো সাজসজ্জাই করে না। তারা জানে বয়সের সৌন্দর্যেই তারা সুন্দর। তুমি যতই সাজবে ততই তোমাকে কৃত্রিম লাগবে। 'আমার আছে জল' ছবির নায়িকা দিলশাদের মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নেই। সে জীবনের জটিলতা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। সে কিন্তু সাজতো না। বুঝেছ ?

বুঝেছি স্যার।

এরপর থেকে মেকাপম্যান যতটুকু মেকাপ দেবে তার বেশি কিছু করবে না। ঠিক আছে ?

জি স্যার, ঠিক আছে।

বলেই সে ঘরে ঢুকে গেল। সারা মুখে আরো বাড়তি কিছু রঙচঙ দিতে, চোখ আঁকতে।

মিউটিনি অন দ্য বাউন্টি

শুটিং চলছে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহের বীজ দানা বাঁধছে। দু'টি দল তৈরি হয়েছে। একদিকে চ্যানেল আই অন্যদিকে গোটা শুটিং দল। শুটিং দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে এফডিসির কামরুল। তার সঙ্গে পরোক্ষভাবে অনেকেই আছে। পরোক্ষ দলের একজন নুহাশ চলচ্চিত্রের জুয়েল রানা।

চ্যানেল আই নেতৃত্ববিহীন। চ্যানেল আই-এর প্রতিভূ কামাল ভেজিটেবল টাইপ চরিত্র। সে কর্মকাণ্ড গোছানো নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। তার সহকারীর (নাম মনে পড়েছে, হীরন) সব কর্মকাণ্ডই অস্পষ্ট। স্টিল চিত্রগ্রাহক নাসির চ্যানেল আই-এর। সে গুপ্তচর গোছের। তার কাজ চ্যানেল আই-এর ঢাকা অফিসকে মোবাইলে খবর সরবরাহ করা (ভুল খবর)।

এক ভোরে কামরুল উপস্থিত। দারুণ উত্তেজিত ভঙ্গিতে জানাল, সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে কাজ শেষ হলে চ্যানেল আই কাউকে টাকাপয়সা দেবে না।

আমি বললাম, চ্যানেল আই কোনো ছোটখাটো প্রতিষ্ঠান না। বিশাল প্রতিষ্ঠান। কমিটমেন্টের টাকা তারা দেবে না এটা কখনো হবে না।

কামরুল নানান উদাহরণ দিতে লাগল। এক পর্যায়ে আমি বললাম, চ্যানেল আই টাকা না দিলে আমি নিজের পকেট থেকে দেব। এখন কি ঠিক আছে ?

জি স্যার, ঠিক আছে।

আমি আর কোনো সমস্যার কথা শুনতে চাই না।

স্যার আর শুনবেন না।

এর মধ্যে ইউরোপ থেকে হাসান ঢাকা ফিরেছে। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি। হাসান চলে এসেছে, আর সমস্যা হবে না। দূরে বসেও সব ঠিকঠাক করার জাদুকরী ক্ষমতা এই ছেলের আছে।

হাসান দেশে ফেরায় সমস্যা কমল না, আরো বাড়ল। সে একদিন টেলিফোন করে (যথেষ্ট বিনয় এবং ভদ্রতার সঙ্গেই) বলল, ভাবি, শুটিং-এ এই অল্প কিছু দিনেই প্রচুর টাকা খরচ হয়ে গেছে। সাগর ভাই চিন্তিত। আপনি কি ব্যাপারটা দেখবেন ?

শাওনের কাছ থেকে খবরটা পেয়ে খুব মন খারাপ হলো। ছবির খরচের পুরোটাই হচ্ছে চ্যানেল আই-এর হাতে। সেখানে খবরদারির কিছু নেই। তাহলে হাসানের কথার অর্থ কি এই যে, আমার কারণে অতিরিক্ত খরচের ব্যাপারটা ঘটছে ?

'দারুচিনি দ্বীপে' শুটিং-এর জন্যে হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমি হেলিকপ্টার ব্যবহার করি নি, চারটা গরুর গাড়ি গাজীপুর থেকে সিলেট নিয়ে গিয়েছি। কারণ সিলেটে গরুর গাড়ি নেই।

হোটেল শেরাটনে ছবির মহরত অনুষ্ঠানের কথা মনে পড়ল। সেই অনুষ্ঠানে ইউনিলিভারের কর্মকর্তা স্পষ্ট করে বলেছিলেন, ভালো ছবির নির্মাণে সব রকম আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এটা কি কথার কথা ?

সাধারণ একটি বিজ্ঞাপন তৈরির বাজেটে কি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র হয় ?

চ্যানেল আই প্রতিবছর বেশ কিছু ছবি বানাচ্ছে। ছবির বাজেট হাস্যকর। পরিচালকরা চুক্তিভিত্তিক। মহানন্দে সেই বাজেটেই ছবি বানিয়ে দিচ্ছেন। এর থেকেই হয়তোবা চ্যানেল আই-এর ধারণা হয়েছে—এই বাজেটেই ছবি হয়।

অনেক আগে বানানো 'শ্রাবণ মেঘের দিন' ছবিতে আমি খরচ করেছিলাম প্রায় এক কোটি টাকা (সে ছবিতে অবশ্যি আরো কিছু সমস্যা ছিল)।

'চন্দ্রকথা' ছবিতে ৭৬ থেকে ৮০ লক্ষ টাকার মতো খরচ হয়েছে। অনেক টাকা চলে গেছে সেট বানানোতে।

সব কিছুর দাম হুহু করে বাড়ছে, সেখানে কী করে চ্যানেল আই-এর বাজেটে ছবি হবে ?

আমি কোনো পরামর্শদাতা না। তারপরেও গায়ে পড়ে ছোট্ট পরামর্শ দিচ্ছি। একজন লাক্স সুন্দরীর পুরস্কার ছবির নায়িকা হওয়া। ব্যাপারটা হাস্যকর। নায়িকা হওয়া অর্জনের বিষয়, পুরস্কারের বিষয় না। তিন থেকে চার বছর পর্যন্ত নির্বাচিত লাক্স সুন্দরী নাটক করবে, টেলিফিল্ম করবে। এদের ভেতর থেকে অভিনয়ে নিপুণ একজনকে নিয়ে প্রতি চার বছর পর ভালো বাজেটে একটা ছবি হবে।

বুঝতে পারছি আমি কোনো কাজের সাজেশন দিচ্ছি না। বর্তমান পৃথিবীর চালিকাশক্তি অর্থ। 'আমার আছে জল'-এর বাইরে পড়ে না। ছবির অর্থের ব্যাপারটা ফয়সালা করবেন ইউনিলিভার, এশিয়াটিক এবং চ্যানেল আই। তারা অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাজনক বিষয়টি বেছে নেবেন। ছবি কী হবে না হবে তা অনেক পরের ব্যাপার।

তবে আমার শিক্ষা সফর সম্পন্ন।

কুশপুত্তলিকা দাহ বিষয়ক জটিলতা

'বহুব্রীহি' নামের একটা কমেডি ধাঁচের নাটক একবার বানিয়েছিলাম। সেই নাটকে একজন বোকা ডাক্তার ছিলেন। নাটক দেখে ডাক্তাররা এবং মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা দারুণ ক্ষেপল। হয়তো তাদের ধারণা বাংলাদেশে কোনো বোকা ডাক্তার নেই। ডাক্তারদের এসোসিয়েশন (বিএমএ বা এই ধরনের কিছু) থেকে সিদ্ধান্ত হলো (!) যে, হুমায়ূন আহমেদ এবং তার পরিবারের কাউকে ডাক্তাররা চিকিৎসা সেবা দেবেন না! এই সময় আমার ছোট মেয়ে বিপাশার প্রচণ্ড দাঁতে ব্যথা। সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, বাবা ডাক্তাররা তো আমার ব্যথা কমাবে না। এখন আমি কী করব ?

আমি মেয়েকে কোলে নিয়ে গেলাম ডাক্তার রতনের কাছে (রতন ডেন্টাল ক্লিনিকের ডাক্তার রতন। তখন তিনি বোধহয় বিকল্প ডেন্টাল ক্লিনিকে ছিলেন, ঠিক মনে পড়ছে না) ডাক্তার রতনকে বললাম, আমার মেয়েটার প্রচণ্ড দাঁতে ব্যথা। আপনি কি তার চিকিৎসা করবেন না-কি তাকে নিয়ে দেশের বাইরে যেতে হবে ?

ডাক্তার রতন বললেন, মা আসো আমার কোলে আসো। আগে কোলে নিয়ে আদর করি তারপর চিকিৎসা।

তখনকার সেই অদ্ভুত সময়ে চারদিকে আমার কুশপুত্তলিকা দাহ করা হতে লাগল এবং আমার লেখা বইয়ে অগ্নিসংযোগ হতে লাগল। আমি খুবই মজা পেলাম।

'বহুব্রীহি'র আগে 'এইসব দিনরাত্রি' নাটকে টুনিকে মেরে ফেলার জন্যে আমার জেলা ময়মনসিংহ শহরেও কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়েছিল।

কুশপুত্তলিকা দাহের ব্যাপারটা সে কারণে আমার মাথার ভেতর ঢুকে আছে।

যখন খবর পেলাম চ্যানেল আই-এর হাসান আসছে সিলেটে আমার সঙ্গে দেখা করতে, তখন ভাবলাম মজা করা যাক—চ্যানেল আই-এর বিরুদ্ধে আমরা শ্লোগান দেব এবং হাসানের একটা কুশপুত্তলিকা দাহ করা হবে।

সবাই এই আইডিয়ায় যথেষ্টই মজা পেল। জাহিদ বলল, শহীদ মিনারের সামনে একবার তারও কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়েছিল। কারণ সে একটা সিগারেট কোম্পানির বিজ্ঞাপনের মডেল হয়েছিল।

লাউয়াছড়ার গহীন অরণ্যে শুটিং হচ্ছে। হাসান শুটিং দেখতে গেল। শুটিং-এর শেষে আমরা যথেষ্ট আনন্দ এবং হাততালির মধ্যে তার কুশপুত্তলিকা দাহ করলাম। হাসান হাসছে এবং হাততালি দিচ্ছে। হাসানের এই আনন্দ যে অভিনয় তখন বুঝতে পারি নি। আমাকে পরে জানানো হয়েছে, তার অধস্তন কর্মচারীদের সামনে তাকে অপমান করা হয়েছে। সে দারুণ আহত।

সমস্যা তার না, সমস্যা আমার। জীবনের হাস্যকর দিকটাই সবসময় আমার চোখে পড়ে। আমি রসিকতা করার চেষ্টা করি। এই রসিকতায় অন্যরা কষ্ট পাবে এটা চট করে মাথায় আসে না। যখন বুঝতে পারি তখন আর শোধরানোর পথ থাকে না। আমার মনে থাকে না যে রসিকতা বন্ধুদের সঙ্গে করা যায়, কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে করা যায় না। হাসানকে তরুণ বন্ধুই ভেবেছি, তাকে চ্যানেল আই-এর কর্তাব্যক্তি কখনো ভাবি নি। হাসানের কাছে Sorry বলা ছাড়া আর কী বলব ? তবে হাসানের মনতুষ্টির জন্যে আমি নিজেই নিজের কুশপুত্তলিকা দাহের

ব্যবস্থা করেছি। অনুষ্ঠানটি হবে নুহাশ পল্লীতে। আমার স্টাফদের সামনে। অনুষ্ঠানে আমি ইউনিলিভার, এশিয়াটিকও চ্যানেল আই-এর কর্তাব্যক্তিদের (!) এবং 'আমার আছে জল'-এর সকল কুশিলবদের নিমন্ত্রণ করব। আমার ধারণা অনুষ্ঠানটি যথেষ্ট আনন্দের হবে।

মজাদার ঘটনা

ছবির বিষয়ে যখনই কোনো সাংবাদিক রিপোর্ট করতে যান তখন তিনি গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করেন, ছবিতে মজাদার কী ঘটনা ঘটেছে? আমাকে এ রকম কোনো প্রশ্ন এখনো কেউ করে নি। আগ বাড়িয়ে নিজেই বলছি।

১

প্রাচীন এক বটগাছের নিচে শুটিং হচ্ছে। মা (মুনমুন) এবং মেয়ে (শাওন) বটগাছের নিচে বসে কথা বলছে। মাস্টার শট নেয়া হয়ে গেছে। হঠাৎ ক্যামেরাম্যান মাহফুজ আমাকে ইশারায় একটা জিনিস দেখালেন। আমি হতভম্ব হয়ে দেখি—দুই অভিনেত্রীর মাথার চার-পাঁচ ফুট ওপরে বটগাছের এক গর্ত থেকে একটি সাপ উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যে-কোনো সময় সে গাছ বেয়ে নিচে নেমে আসবে এবং দুই অভিনেতীর সঙ্গে যুক্ত হবে।

আমি ইশারায় মাহফুজকে বললাম, শুটিং বন্ধ করার দরকার নেই। শুটিং চলুক। সাপ যদি সত্যি নেমে আসে তখন দেখা যাবে। এই একটি দৃশ্যে আমি দুই অভিনেত্রী কী অভিনয় করছে তা দেখি নি, সারাক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম সাপের দিকে।

২

এই ছবিতে অনেকগুলি গান আছে। গানের কোরিওগ্রাফিতে সাহায্য করার জন্যে যে ছেলেটি আছে তার নাম রহিম। কেউ তাকে নাম জিজ্ঞেস করলে সে অবশ্যি রহিম বলে না, বলে 'রয়'। রহিম নামে মনে হয় তার মর্যাদা ঠিকমতো প্রকাশ পায় না। যাই হোক, একদিন দেখি সে ব্যস্ত হয়ে নিষাদকে নাচ দেখাচ্ছে। নিষাদের সামনে মুদ্রা করছে, কোমর দোলাচ্ছে। আমি বললাম, রয় শোন। আমার ছেলে বড় হয়ে গোঁফ কামিয়ে পুরুষ নৃত্যশিল্পী হবে এটা আমার ইচ্ছা না। তুমি এই কাজটা করবে না।

রয় বলল, জি আচ্ছা স্যার।

সে মুখে বলল, জি আচ্ছা কিন্তু তার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে লাগল। নিষাদ মনে হয় ব্যাপারটায় মজা পেল। রয়কে দেখলেই সে হাত নাড়ায় এবং কোমর দোলানোর চেষ্টা করে।

শুটিং অনেক দিন হলো শেষ হয়েছে, রয়ের ভূত নিষাদের ঘাড় থেকে নামে নি। কোথাও গান হলেই সে হাত নাড়ে এবং কোমর দোলানোর চেষ্টা করতে গিয়ে আছাড় খায়।

৩

আমরা তিনটা জেনারেটার নিয়ে গিয়েছিলাম। জেনারেটারের একজন এসে বলল, তিনটা জেনারেটারের একটাতে ভূতের আছড় হয়েছে। এখন কী করা?

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, জেনারেটরে ভূতের আছড় মানে?

সে বলল, যে-ই জেনারেটারের আশেপাশে যাচ্ছে সে-ই আহত হচ্ছে। ছয় থেকে সাতজন বিনা কারণে আহত।

আর কিছু?

ক্যামেরা যখন বন্ধ থাকে তখন ভোল্টেজ ঠিক থাকে কিন্তু ক্যামেরা চালু করলেই ভোল্টেজ আপ ডাউন হয়।

ভূত তাড়ানোর কী ব্যবস্থা করতে হবে সেটা বলো।

মুনসি মওলানা এনে ফুঁ দেওয়াতে হবে।

মুনসি মওলানা খবর দিয়ে আনো।

হযরত শাহজালাল (রাঃ) সাহেবের মাজার জিয়ারত

আমরা যেখানে শুটিং করছি সেখান থেকে হযরত শাহজালাল (রাঃ) সাহেবের দরগা এক-দেড় ঘণ্টার পথ। একদিন শুটিং বন্ধ রেখে দলবেঁধে রওনা হলাম মাজার জিয়ারতে। নিষাদকে পায়জামা-পাঞ্জাবি এবং টুপি পরানো হলো। তাকেও যথেষ্ট উৎসাহী মনে হলো।

নিষাদকে কোলে নিয়ে মাজার শরীফের দিকে যাচ্ছি, আমাকে জানানো হলো—শিশুদের প্রবেশ নিষেধ।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন?

মেয়েশিশু তো কোনোক্রমেই ঢুকতে পারবে না। পুরুষশিশুরাও নিজে নিজে হাঁটতে না পারা পর্যন্ত ঢুকতে পারবে না।

নিষাদ হাঁটার পরীক্ষা দিল। তিন-চার কদম নিজে হেঁটে থপ করে পড়ে গেল।

নিতান্ত অনিচ্ছায় নিষাদকে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেয়া হলো। আমি ভাবছি, হযরত শাহজালাল (রাঃ) কি শিশুদের বিষয়ে এই নিষেধাজ্ঞা নিজে দিয়ে গেছেন ? না-কি দরগার লোকজন এইসব অদ্ভুত নিয়ম বানিয়েছেন ? আমাদের নবীজি যখন নামাজ পড়তেন তখন তাঁর গলা ধরে ঝুলত তাঁর নাতিরা।

হযরত শাহজালাল (রাঃ) সাহেবের মতো মহামানব মেয়েশিশু এবং পুরুষশিশুর মধ্যে ভেদাভেদ করবেন ? তাদের কাছে আসতে দেবেন না ? দরগার সেবায়েতরা একটি তথ্য ভুলে গেলেও হযরত শাহজালাল (রাঃ) অবশ্যই কখনো ভুলেন না যে, তাঁরও জন্ম হয়েছিল এক মায়েরই গর্ভে। মেয়েরা কেন অস্পৃশ্য হবে ?

পাদটিকা

ছবি শেষ। আমি সাড়ে তিন বছর বয়েসী অভিনেতা ওয়াফাকে বললাম, ওয়াফা! সবচে' ভালো অভিনয় কে করেছে ?

ওয়াফা বলল, আমি।

আমার আরেক শিশুশিল্পী মালিহাকে (বয়স চার) জিজ্ঞাস করলাম, ভেবে চিন্তে বলো। এই ছবিতে সবচে' ভালো অভিনয় কে করেছে ?

মালিহা অনেকক্ষণ চিন্তা করে বলল, স্যার আপনি।

একজনকে বিশেষ ধন্যবাদ

সেই একজন শাওন। বিশেষ ধন্যবাদের কারণ ব্যাখ্যা করি। 'আমার আছে জল' ছবির কোরিওগ্রাফারের নাম রতন। রতন ছবি শুরু হবার সাতদিন আগে জানাল সে কাজ করবে না। আমি শাওনকে সেই দায়িত্ব দিলাম।

সে বলল, আমি যখন অভিনয় করি তখন অন্যকিছু নিয়ে চিন্তা করতে পারি না।

আমি বললাম, পারতে হবে।

কোরিওগ্রাফির কাজটি সে করেছে। দর্শক দেখবেন কত ভালো করেছে।

একই সঙ্গে মীমকে অভিনয় করার প্রতিটি বিষয় ধৈর্য ধরে দেখিয়েও দিয়েছে। তার একটাই কথা, মীম খারাপ করলে সে একাই সবাইকে টেনে নিচে নামিয়ে আনবে।

এরচে'ও বড় কাজ সে যা করেছে তা হলো, আমার রাগ কন্ট্রলের ভেতর রাখার চেষ্টা। আমার কাছে কেউ যেন সমস্যা নিয়ে না আসে সে ব্যবস্থা করা। মানুষটা ছবি নিয়ে ভাবুক, অন্যকিছু নিয়ে যেন তাকে ভাবতে না হয়।

শাওন যখন দেখেছে আমার মনমেজাজ খারাপ তখনই ঢাকায় টেলিফোন করে অন্যপ্রকাশের মাজহারকে বলেছে, মাজহার ভাই, আপনার স্যারের মেজাজ খারাপ মন খারাপ। সব বন্ধুবান্ধব নিয়ে এক্ষুনি ঢাকা থেকে রওনা হন। আড্ডা দিয়ে তার মন ঠিক করে দিয়ে যান।

মাজহার মাইক্রোবাস ভর্তি লোকজন নিয়ে বারবার উপস্থিত হয়েছে।

হলে বসে লোকজন যখন ছবিটা দেখবে তখন নেপথ্যের মানুষদের ভূমিকা কেউ জানবে না। না জানলেও ক্ষতি কিছু নেই।

দীর্ঘ লেখা শেষ করছি। ছবির সঙ্গে যুক্ত সবার জীবন মঙ্গলময় হোক, এই শুভ কামনা।